সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি নং - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

- বর্ষ : ৬৪
- সংখ্যা : ৪৩-৪৪
- বার : সোমবার

- ০৭ আগস্ট- ২০২৩ ঈসায়ী
- ২৩ শ্রাবণ- ১৪৩০ বাংলা
- ১৯ মুহার্‌রম- ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
জনাব চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	:	০১৭৬১৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	:	০১৯৩৩৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	:	০১৭১৬৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	:	০১৯৩৩৩৫৫৯০১	টেলিফোন	:	০২-৭৫৪২৪৩৪

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

weeklyarafat@gmail.com
jamiyat1946.bd@gmail.com
www.weeklyarafat.com
www.jamiyat.org.bd
Shaptahik Arafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল-কুরআনের জ্যোতি** ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - **মহান আল্লাহর পথে ব্যয়ের গুরুত্ব**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ০৫
- **প্রবন্ধ :**
  - **ইসলামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও অন্যান্য ধর্মের প্রতি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি**
    প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম- ১১
  - **মহান আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কতিপয় জাতির ইতিকথা**
    আবু সা'আদ ড. মো. ওসমান গনী- ১৭
  - **বিদআতের সরলাংক**
    আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন- ২০
  - **শরীরে ট্যাটু অঙ্কন ও শরঈ বিধান**
    আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল- ২২
  - **বক্তৃতা ও বিবৃতি প্রদানে রাসূল (ﷺ)-এর আদর্শ**
    মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন- ২৪
- **ক্বাসাসুল ক্বুরআন :**
  - **বাগান মালিক ও তার সন্তানদের ঘটনা**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ২৮
- **বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস** ৩০
- **ইতিহাস-ঐতিহ্য :**
  - **শহীদি রক্তে স্নাত ঐতিহাসিক কারবালা**
    সহ. অধ্যা. মো. আ. সাত্তার ইবনু ইমাম- ৩৩
- **মহিলাজগৎ :**
  - **ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার**
    অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ৩৬
- **বিজ্ঞান-বিস্ময়** ৩৯
- **কবিতা** ৪০
- **জমঈয়ত সংবাদ** ৪০
- **স্বাস্থ্য-সচেতনতা** ৪১
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪৩
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৭

সম্পাদকীয়

ফাতাওয়ার বাজার গরম : জাতির করণীয় কী?

কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান রাখেন এমন শ্রেণিকে আলেম-ওলামা বলে। তাঁরা নবীগণের উত্তরাধিকারী। সে সূত্রে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মতের মধ্যে যাঁরা ইসলামী শরিয়ত সম্পর্কে জানেন, তাঁরাই নবী (ﷺ)-এর ওয়ারিশ। নবীগণ অর্থ-কড়ির ওয়ারিশ রেখে যান না। তাঁরা কেবল মহান আল্লাহর ওয়াহীর জ্ঞান রেখে যান। যিনি এ জ্ঞান আহরণ করতে পারেন, তিনিই যথার্থ ওয়ারিশ। যাঁরা সত্যিকারার্থে আল্লাহভীরু হয়ে থাকেন। তাঁরাই এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ সন্তান। এ সব শ্রেষ্ঠ সন্তান তথা আলেম-ওলামা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তার দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণের মহান খিদমত নিয়ে থাকেন। কুরআন ও হদীসের জ্ঞান আলোকবর্তিকা। এটি এক অপরিমেয় শক্তি, যার দ্বারা উদ্ভাসিত ব্যক্তি নিখাদ তাওহীদের ভিত্তিমূলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সক্ষম হন। 'ইবাদত-বন্দেগীতে সদা নিয়োজিত থাকেন। ফর্‌য 'ইবাদত আদায়ের পাশাপশি নফলে অগ্রণী হন। কুরআন তিলাওয়াত ও যিক্‌র-আযকার তাঁদের নিত্যদিনের 'আমল। আচার-ব্যবহারে হন তাঁরা মার্জিত ও মিষ্টভাষী। কথা ও কাজে মিল রাখতে সদা প্রাণপণ। আল্লাহর দেওয়া সময়কে পূর্ণ আমানত মনে করে একটি মুহূর্তও নষ্ট করেন না। পোশাক-পরিচ্ছেদ ও আহার গ্রহণে হন মিতব্যয়ী। দুনিয়াবী লোভ-লালসা তাঁদেরকে পায় না। একজন অপরিচিত মানুষ যেমন খুব সাবধানে চলে, আল্লাহ ভীরু আলেমগণ ঠিক তদ্রূপ নিরহংকার জীবন-যাপন করেন। ক্ষণস্থায়ী এ জীবন তাঁদের কাছে একটি সফরসদৃশ। রুটিন মতো কার্য সম্পাদন করে আসল ঠিকানায় প্রস্থান-ই তাঁদের মূল লক্ষ্য। এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের আলেম-ওলামাই নবী-রাসূলগণের প্রকৃত ওয়ারিশ।

পক্ষান্তরে ওয়াহীর জ্ঞান রাখার পরও যারা সেমতে জীবন-যাপন করেন না; বরং শরঈ ইল্‌মকে দুনিয়া হাসিলের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে, তারাই নিকৃষ্ট ওলামা। এরা জাতির বোঝা বৈ আর কিছু না। এদের দ্বারা সরলমতি মুসলিম প্রতারিত হন। পরকালের পথের বদলে দুনিয়ার গোলক ধাঁধায় হারিয়ে যায় অনেকে। আর ওদের দেখে কিছু মানুষ ইসলাম সম্পর্কে ভুল বুঝতে শুরু করে। দ্বীনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অবশেষে দোষারোপ করতে থাকে ইসলামের নামে তথাকথিত ফেরিওয়ালাদের। দুনিয়াদার এসব আলেম-এর প্রতারণা খুবই মারাত্মক। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আলেমদেরকে উত্তম আবার অধমও বলেছেন। যাঁরা আল্লাহ ভীরু, তাঁরাই হক্বানী আলেম। আলেমের খোলসে প্রতারকরাই জাতির অধম সন্তান। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের আগে দ্বীনদার আল্লাহ ভীরু আলেমগণকে উঠিয়ে নেবেন। সাথে সাথে 'ইল্‌ম বিদায় নেবে। জাহেলদেরকে আলেম মনে করে মানুষেরা প্রতারিত হবে। 'ইল্‌ম উঠে যাওয়া এবং জাহালত বা অজ্ঞতা জেঁকে বসা কিয়ামতের আলামত। সে আলামত বর্তমানে দৃশ্যমান। কিছু সনদদারী আলেমকে প্রসিদ্ধি অর্জন ও ভাইরাল রোগে আক্রান্ত করেছে। ফলে ঐ শ্রেণির আলেমদের মাঝে জাগতিক প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। আর সাধারণ মুসলিম বিশেষতঃ যুবকশ্রেণী ভাইরাল রোগে সংক্রমিত হচ্ছে। আলেম ও বক্তার মাঝে পার্থক্য করতে পারছে না।

জাল বা মাওজূ' হাদীস প্রসারের ইতিহাসে পাওয়া যায় ঐসব ভাইরাল বক্তা। বর্তমানেও এরা বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনি বলার পাশাপাশি ভুল ফাতাওয়া দিয়ে সমাজকে বিভ্রান্ত করছে। অথচ ফাতাওয়ার ব্যাপারে সালাফগণ ছিলেন খুবই সচেতন। গভীর গবেষণা ছাড়া হুটহাট করে তাঁরা ফাতাওয়া দিতেন না। ইজতেহাদী মাসআলায় একটি ফাতাওয়া দিয়ে দম্ভ করতেন না; বরং আরো অধিকতর গবেষণায় আগের প্রদত্ত ফাতাওয়া ভুল মনে হলে সাথে সাথেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতেন। এ ক্ষেত্রে সঠিক মাসআলায় ফিরে যাওয়াকেই তাঁরা মুনাসিব মনে করতেন। কোনো প্রকার জেদ বা অহমিকা তাঁদের মাঝে পাওয়া যেত না। ফাতাওয়া দিয়ে বলতেন– আমার জানামতে এ ফাতাওয়া দিলাম। মনে রাখবেন, প্রকৃত 'ইল্‌ম মহান আল্লাহর। তিনিই সঠিক ফায়সালার ব্যাপারে সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

বর্তমানে পরিতাপের সঙ্গে লক্ষণীয় যে, কোনো কোনো বক্তা নিজ ফাতাওয়াকেই চূড়ান্ত বলে সমাজে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছেন। আর তাদের ভক্তগণ ঠিক ঠিক বলে স্লোগানে মেতে ওঠছেন। সাধারণ জনগণ যদি শর'ঈ মাসআলার ঠিক বেঠিক নির্ধারণের ক্ষমতা রাখেন, তাহলে আলেমগণের জ্ঞান-গবেষণার দরকার কী? মক্কা-মদীনার আলেমগণকে এরূপ দেখা যায় না। তাঁরা জ্ঞান-গবেষণায় সদা মগ্ন থাকেন। বিজ্ঞ আলেম ব্যতীত কেউ ফাতাওয়া দেয় না। কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে অধিকতর জ্ঞানী আলেম-এর দিকে তা নিসবত করেন। আমরা জানি, নিকট অতীতে হজ্জ সফরে মীনার আল-খাইফ মসজিদে এ শতাব্দীর তিন শ্রেষ্ঠ আলেম একত্রিত হয়েছিলেন। 'আক্বীদাহ্ বিষয়ের প্রশ্ন হলে শাইখ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) জওয়াব দিয়েছিলেন। ফিকহী মাসআলা হলে তিনি তা শাইখ ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ)-কে জবাব দিতে বলেছেন এবং হাদীসের শুদ্ধতা সম্পর্কিত প্রশ্ন হলে শাইখ আলবানীকে উত্তর দিতে বলেছেন। কৈ তাঁদের মধ্যে তো কোনো বিরোধ দেখা দেয়নি। কিন্তু আমাদের সমাজ পুরো ভিন্ন। বেশিরভাগ বক্তাকেই সব জান্তা মনে হয়। আর সাধারণ মানুষ বক্তার হুংকারে বিমূঢ় হয়ে পড়েন এবং যাকে তাকে মাসআলা জিজ্ঞেস করেন। গহিন অন্ধকারের দিকে কী আমরা ক্রমেই ধাবিত হচ্ছি? বিষয়টি তলিয়ে দেখা আজ সময়ের দাবি হয়ে পড়েছে। মহান আল্লাহ-ই আমাদের একমাত্র সহায়। ❑

আল-কুরআনের জ্যোতি

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার বাণী :

۞ ﴿وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا﴾

☆ "আল্লাহর অনুমতিক্রমে কেবলমাত্র আনুগত্য করার জন্যই আমরা রাসূলদের প্রেরণ করেছি। যখন তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে তখন তারা আপনার কাছে আসলে ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাবে।" *(সূরা আন্ নিসা : ৬৪)*

۞ ﴿قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ﴾

☆ "বলুন, হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। কাজেই তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তার রাসূল উম্মী নবীর প্রতি যিনি আল্লাহ ও তার বাণীসমূহে ঈমান রাখেন। আর তোমরা তার অনুসরণ করো, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।" *(সূরা আল আ'রাফ : ১৫৮)*

۞ ﴿مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا﴾

☆ "যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে মুখ ফিরিয়ে নিলো, আমি তাদের উপর তোমাকে প্রহরীরূপে প্রেরণ করিনি।" *(সূরা আন্ নিসা : ৮০)*

۞ ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا﴾

☆ "হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করো, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রাসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)-দের অনুগত হও। আর যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হলো উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" *(সূরা আন্ নিসা : ৫৯)*

۞ ﴿وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴾

☆ "আর তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পার।" *(সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৩২)*

۞ ﴿وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴾

☆ "তোমরা যথাযথভাবে নামায পড়ো, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য করো; যাতে তোমরা করুণাভাজন হতে পার।" *(সূরা আন্ নূর : ৫৬)*

হাদীসে রাসূল ﷺ

মহান আল্লাহর পথে ব্যয়ের গুরুত্ব

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ : قَالَ اللهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ.

সরল অনুবাদ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি দান করো। আমি তোমাকে দান করব'।[১]

হাদীসের রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচিতি : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নামের ব্যাপারে ২০টির মতো মতামত পাওয়া যায়।[২] প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল 'আব্দুশ্ শামস বা আবদে 'উমার।[৩]

ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় 'আব্দুর রহমান। কেউ বলেন তার নাম আব্দুর রহমান ইবনু আইদ।[৪]

তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের সুলায়ম ইবনু ফাহাম বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সাখর এবং মাতার নাম উম্মিয়া বিনতু সফীহ মতান্তরে মায়মুনা।

আবূ হুরাইরাহ্ নামে নামকরণ : একদিন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জামার আস্তিনের নিচে একটি বিড়াল ছানা নিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হন। বিড়ালটি হঠাৎ সবার সামনে বেরিয়ে পড়ল। এ অবস্থা দেখে রাসূল (ﷺ) তাঁকে রসিকতা করে– 'হে বিড়ালের পিতা'! বলে সম্বোধন করলেন। এরপর থেকে তিনি আবূ হুরাইরাহ্ নামে খ্যাতি লাভ করেন।[৫]

ইসলাম গ্রহণ : তিনি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরিতে মুহার্‌রম মাসে খায়বর যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছরের মতো।[৬]

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : ইসলাম গ্রহণের পর হতে তিনি ইসলামের সকল যুদ্ধে রাসূল (ﷺ)-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন।[৭]

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান : সাহাবীদের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৫৩৭৪টি, মতান্তরে ৫৩৭৫টি।[৮]

ইমাম বুখারীর মতে, আট শতাধিক রাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসহাবে সুফ্‌ফা-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মৃত্যু : ৫৭ মতান্তরে ৫৮/৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাকে বাকীউল গারক্বাদে দাফন করা হয়।[৯]

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফযীলত অনেক। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। যেমন–

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○ وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۭ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ﴾

---

[১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৩৫২; সহীহ মুসলিম- হা. ৯৯৩; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- অধ্যায় : 'যাকাত', অনুচ্ছেদ : 'দানের প্রশংসা ও কৃপণতার নিন্দা', হা. ১৮৬২, সহীহ।*

[২] *শরহে মুসলিম- ইমাম নববী, ১/৭ পৃ.।*

[৩] *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাঈন- ইমাম হাফিয আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-হাকিম আন-নিশাপুরী, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪৬১/১৯৯০), ৩/৫৮১ পৃ.।*

[৪] *তাকরীবুত তাহযীব- হাফেয শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনু আলী ইবনু হাজার আল-আসকালানী, (ভারত : আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়াহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৮/১৪০৮), পৃ. ৬৮০; উসদুল গাবাহ- ইবনুল আসীর, ৫/৩১৬ পৃ.;ত্বাবাক্বাত ইবনু সা'দ- ইবনু সা'দ, ৪/৩২৫ পৃ.।*

[৫] *আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাঈন- ৩/৫৭৯।*

[৬] *সিয়ার আলামিন নুবালা- শামসুদ্দীন আয যাহাবী, (বৈরুত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৪/১৯৯৬), ২/১৯৫।*

[৭] *তালেবুল হাশেমী/বিশ্বনবীর সাহাবী- অনুবাদ : আব্দুল কাদের (ঢাকা : আ. প্র. ১৪১৪/১৯৯৪), ১/১৩৫।*

[৮] *আসমাউস সাহাবাতির রুয়াত- পৃ. ৪; তালক্বী- পৃ. ১৮৪; শরহে মুসলিম- নববী, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ৮; উমদাতুল ক্বারী- ১/১২৪।*

[৯] *তাহযীবুত তাহযীব- হাফেয শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনু আলী ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ১২/২৪০।*

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে –যারা এমন করবে (উদাসীন হবে) তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যে রিয্‌ক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে; (অন্যথায় মৃত্যু আসলে) সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য কেন অবকাশ দাও না, দিলে আমি সাদাক্বাহ্ করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকেও অবকাশ দিবেন না। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।[১০]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মৃত্যু আসার পূর্বেই দান করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছেন। কেননা হাদীসে এসেছে–

اَلصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ. দান দলিলস্বরূপ।

আর এ দান করতে হবে অবশ্যই মৃত্যু আসার পূর্বে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে দানের ব্যাপারে অসংখ্য আয়াত এসেছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ۭ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিয্‌ক দান করেছি তা হতে তোমরা ব্যয় করো এমন এক দিন আসার আগে যেদিন কোনো বেচাকেনা, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ কাজে আসবে না। মূলতঃ কাফিররাই অত্যাচারী।"[১১]

﴿اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاۗءِ وَالضَّرَّاۗءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۭ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

"যারা সচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীলতা; আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।"[১২]

﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۭ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾

"যারা আল্লাহর পথে তাদের মাল খরচ করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে একটি শস্যদানা যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে। প্রত্যেক শীষে এক শত শস্যদানা থাকে আর আল্লাহ যাকে চান তাকে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ প্রশস্তকারী, মহাজ্ঞানী।"[১৩]

﴿وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

"আর তোমরা আল্লাহর পথে খরচ করো এবং নিজ হাতকে ধ্বংসের দিকে প্রসারিত করো না এবং এহসান করতে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কল্যাণ কামনাকারীদেরকে ভালোবাসেন।"[১৪]

দানের ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে এসেছে– 'ইয়ায ইবনু গুতাইফ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, আবূ 'উবায়দাহ্ ইবনুল জার্‌রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তাকে দেখতে যাই। তাঁর স্ত্রী শিয়রে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম আবূ 'উবাইদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র রাত কিরূপ অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে? তিনি বলেন, রাত্রি অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে। সেই সময় তাঁর মুখমণ্ডল দেওয়ালের দিকে ছিল। এই কথা শুনা মাত্রই তিনি জনগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, আমার এ রাত্রি কঠিন অবস্থায় কাটেনি। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন :

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبِسَبْعِمِائَةٍ وَمَنْ أَنْفَقَ عَلٰى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ أَوْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ مَازَ أَذًى فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرُقْهَا وَمَنِ ابْتَلَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبَلَاءٍ فِيْ جَسَدِهِ فَهُوَ لَهُ حِطَّةٌ.

'যে ব্যক্তি নিজের উদ্বৃত্ত জিনিস মহান আল্লাহর পথে দান করে, সে সাতশ' পুণ্যের অধিকারী হয়। আর যে ব্যক্তি নিজের জীবনের ওপর ও পরিবারবর্গের ওপর খরচ করে সে দশগুণ পুণ্য লাভ করে। যে রোগাগ্রস্ত ব্যক্তিকে পরিদর্শন করতে যায় তারও দশগুণ পুণ্য লাভ হয়। সাওম হচ্ছে ঢালস্বরূপ যে পর্যন্ত না তা নষ্ট করা হয়। যে ব্যক্তি শারীরিক বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা ও রোগে আক্রান্ত হয়, ঐগুলো তার পাপসমূহ ঝেড়ে ফেলে।'[১৫]

---

[১০] *সূরা আল মুনাফিকূন : ৯-১১।*
[১১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৫৪।*
[১২] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৩৪।*
[১৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৬১।*
[১৪] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৫।*
[১৫] *হাদীসটি সহীহ; মুসনাদ আহমাদ- ১/১৯৫, ১৯৬; আল মাজমা'উয যাওয়ায়িদ- ২/৩০০।*

অন্য আরেকটি হাদীসে রয়েছে যে, একটি লোক লাগাম বিশিষ্ট একটি উষ্ট্রী দান করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : লোকটি কিয়ামতের দিন সাতশত লাগাম বিশিষ্ট উষ্ট্রী প্রাপ্ত হবে।[১৬]

তবে ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) আরো বর্ণনা করেছেন– এক ব্যক্তি লাগামসহ একটি সুসজ্জিত উট নিয়ে এসে বলেন : হে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! এটি মহান আল্লাহর উদ্দেশে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : কিয়ামত দিবসে তুমি এ জন্য সাত শতটি উট প্রাপ্ত হবে।[১৭]

দান সম্পদ বৃদ্ধি করে

﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾

"যারা আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করে তার উদাহরণ হচ্ছে সেই বীজের মতো যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। আর প্রতিটি শীষে একশতটি করে দানা থাকে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অতিরিক্ত দান করেন। আল্লাহ সুপ্রশস্ত সুবিজ্ঞ।"[১৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

"مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ".

"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে কোনো কিছু ব্যয় করবে তাকে সাতশত গুণ সওয়াব প্রদান করা হবে।"[১৯]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেন– "যে ব্যক্তি নিজের হালাল কামাই থেকে (আল্লাহ তা'আলা হালাল কামাই ছাড়া দান কবুল করেন না) একটি খেজুর সাদাক্বাহ্ করে, আল্লাহ তা'আলা সেটা ডান হাতে কবুল করেন, অতঃপর তা বৃদ্ধি করতে থাকেন, যেমন- তোমরা ঘোড়ার বাচ্চাকে প্রতিপালন করে থাকো, এমনকি সেটা একটি পাহাড় পরিমাণ হয়ে যায়।"[২০]

দান-সাদাক্বাহ্ করলে সম্পদ কমে না

আবূ কাবশা আল আনমারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

«مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ».

"সাদাক্বাহ্ করলে কোনো মানুষের সম্পদ কমে না।"[২১]

দানকারীর জন্য ফেরেশ্‌তা দু'আ করে

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশ্‌তা অবতরণ করেন। তাদের একজন দানকারীর জন্য দু'আ করে বলেন,

"اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا".

"হে আল্লাহ! দানকারীর মালে বিনিময় দান করো (বিনিময় সম্পদ বৃদ্ধি করো)।" আর দ্বিতীয়জন কৃপণের জন্য বদ দু'আ করে বলেন,

"اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا".

"হে আল্লাহ! কৃপণের মালে ধ্বংস দাও।"[২২]

দানকারীর দুনিয়া আখিরাতের সকল বিষয় সহজ করে দেয়া হয়

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

مَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

"যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা তার দু'নিয়া ও আখিরাতের সকল বিষয় সহজ করে দিবেন।"[২৩]

গোপনে দান করার ফযীলত

গোপন-প্রকাশ্যে যে কোনোভাবে দান করা যায়। সকল দানেই সওয়াব রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿إِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾

"যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করো, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি গোপনে ফকীর-মিসকিনকে দান করে দাও, তবে এটা বেশি উত্তম। আর তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।"[২৪]

গোপনে দানকারী কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর আরশের নীচে ছায়া লাভ করবে। নবী (ﷺ) বলেন,

---

[১৬] *মুসনাদ আহমাদ- ৪/১২১।*
[১৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৫০৫; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৩১৮৭; সুনান আদ্ দারিমী- হা. ২৪০২।*
[১৮] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৬১।*
[১৯] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৯০৩৫, সনদ সহীহ।*
[২০] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম।*
[২১] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৩২৫, সহীহ; সুনান ইবনু মাজাহ্।*
[২২] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৪৪২; সহীহ মুসলিম- হা. ১০১০।*
[২৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৯৯।*
[২৪] *সূরা আল বাক্বারাহ্ হা. ২৭১।*

"কিয়ামত দিবসে সাত শ্রেণির মানুষ আরশের নীচে ছায়া লাভ করবে। তন্মধ্যে এক শ্রেণি হচ্ছে–

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ.

"এক ব্যক্তি এত গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি দান করে বাম হাত জানতেই পারে না।"[২৫]

দান-সাদাক্বাহ্ গুনাহ মাফ করে ও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায়

নবী (ﷺ) বলেন, "হে কাব ইবনু উজরাহ্! সালাত (মহান আল্লাহর) নৈকট্য দানকারী, সিয়াম ঢালস্বরূপ এবং দান-সাদাক্বাহ্ গুনাহ মিটিয়ে ফেলে যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে।"[২৬] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

«اَتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ».

"খেজুরের একটি অংশ দান করে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করো।"[২৭]

মানুষ কিয়ামতে দান-সাদাক্বার ছায়াতলে থাকবে

'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেন, "নিশ্চয় দান-সাদাক্বাহ্ দানকারী থেকে কবরের উত্তাপ নিভিয়ে দিবে। আর মু'মিন কিয়ামত দিবসে নিজের সাদাক্বার ছায়াতলে অবস্থান করবে।"[২৮]

মহান আল্লাহর পথে ব্যয়ের নীতিমালা

প্রতিটি মুসলমানের মহান আল্লাহর রাস্তায় দান করার সঠিক পদ্ধতি ও শর্তগুলো জেনে রাখা আবশ্যক। নিম্নে এই নীতিমালা তুলে ধরা হলো–

নিয়ত বিশুদ্ধ রাখা : দান হতে হবে শুধু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـكِنَّ اللهَ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ﴾

"তাদের সৎপথ গ্রহণের দায়িত্ব তোমার নয়; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করো, তা তোমাদের নিজেদের জন্য এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থেই ব্যয় করে থাকো। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করো, তার পুরস্কার তোমাদের পুরাপুরিভাবে প্রদান করা হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"[২৯]

দান-খয়রাত করার সময় এ বিষয়ে খুবই গুরুত্ব দিতে হবে। দান-খয়রাত করতে হবে শুধু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। কারো মনে যদি অন্য কিছু চলে আসে, মানুষ দেখানো উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেই দান কোনো কাজে আসবে না।

প্রভাব বিস্তার না করা : আমরা অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে কোনো উপকার করলে তার ওপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করি। আমি তার অমুক উপকার করেছি। এখন সে আমার কথা শুনতে বাধ্য এমন মনোভাব রাখা যাবে না। ইরশাদ হয়েছে–

﴿اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَلَا اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর নিজেদের অনুগ্রহের কথা বলে বেড়ায় না আর কাউকে কষ্টও দেয় না, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের কোনো দুঃখ, মর্মবেদনা ও ভয় নেই।"[৩০]

অর্থাৎ- মহান আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে যে কারো ওপর প্রভাব খাটায় না, কাউকে কষ্ট দেয় না, খোঁটা দেয় না, আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে তাদের প্রতিদান দেবেন। তাদের প্রতিদান নষ্ট হওয়ার কোনো ভয় নেই এবং তারা নিজেদের এই অর্থ ব্যয়ের কারণে লজ্জিত হবে এমন ধরনের কোনো অবস্থারও সৃষ্টি হবে না।

মহান আল্লাহর পথে উত্তম জিনিস ব্যয় করা : আমরা অনেক সময় রাস্তাঘাটে কোনো ভিক্ষুককে দান করার সময় বেছে ছেঁড়া টাকাটা দিই। জামাকাপড় দেওয়ার সময় পুরনো ও ব্যবহারের অযোগ্যগুলো দিই। খাবার নষ্ট হয়ে গেলে তারপর গরিবদের দিই। এটা উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللهَ بِهٖ عَلِيْمٌ﴾

---

[২৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৪২৩; সহীহ মুসলিম।*
[২৬] *আবূ ইয়ালা, সনদ সহীহ।*
[২৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৪১৭; সহীহ মুসলিম- হা. ১০১৬।*
[২৮] *তাবারানী, বাইহাক্বী, সনদ সহীহ।*
[২৯] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৭২।*
[৩০] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৬২।*

"তোমরা কখনও নেকী পাবে না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে খরচ করো। আর তোমরা যা কিছুই দান করো আল্লাহ তা জানেন।"[৩১]

এই আয়াত যখন নাযিল হয়, সাহাবাগণ কীভাবে উত্তম বস্তু দান করায় লেগে পড়েছিল তা এই ঘটনা দ্বারা অনুমান করা যায়। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, মদীনার আনসারগণের মধ্যে আবূ ত্বালহাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি। তাঁর সবচাইতে বেশি খেজুর-বৃক্ষ ছিল। সমস্ত বাগানের মধ্যে 'বাইরহা' নামক বাগানটি ছিল তাঁর (আবূ ত্বালহার) অধিক পছন্দনীয়। বাগানটি মসজিদে নববীর সামনেই অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই বাগানে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতেন। সেখানকার পানি খুবই উত্তম ছিল, তিনি তা পান করতেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হয়,

﴿لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ﴾

অর্থাৎ- "যতক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্লাহর রাহে) খরচ না করবে, ততক্ষণ তোমরা নেকের অধিকারী হবে না।" তখন আবূ ত্বালহাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, "যতক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্লাহর রাহে) খরচ না করবে, ততক্ষণ তোমরা সওয়াবের অধিকারী হবে না।" আর আমার প্রিয় বস্তু হলো এই 'বাইরহা'। আমি এটা মহান আল্লাহর রাস্তায় সাদাক্বাহ্ করলাম। এর বিনিময়ে আমি নেকির আশা রাখি এবং এটা মহান আল্লাহর নিকট জমা রাখছি। সুতরাং ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি এটাকে যেভাবে ইচ্ছা কবুল করুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, বাহবা! এটা অত্যন্ত লাভজনক মাল, এটা অত্যন্ত লাভজনক মাল। তুমি এই বাগান সম্বন্ধে যা কিছু বলেছ আমি তা শুনেছি। আমার মনে হয়, তুমি এই বাগান তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করে দাও। আবূ ত্বালহাহ্ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি তা বিতরণ করে দিব। অতএব আবূ ত্বালহাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার আত্মীয়-স্বজন ও চাচাত ভাইগণের মধ্যে তা বন্টন করে দিলেন।[৩২] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ﴾

"হে ঈমানদারগণ! যে অর্থ তোমরা উপার্জন করেছ এবং যা কিছু আমি জমিন থেকে তোমাদের জন্য বের করে দিয়েছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করো। তাঁর পথে ব্যয় করার জন্য তোমরা সবচেয়ে খারাপ জিনিস বাছাই করার চেষ্টা করো না; অথচ ওই জিনিসই যদি কেউ তোমাদের দেয়, তাহলে তোমরা কখনো তা নিতে রাজি হইও না, যদি না তা নেওয়ার ব্যাপারে তোমরা চোখ বন্ধ করে থাকো। তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সর্বোত্তম গুণে গুণান্বিত।"[৩৩]

গোপনে দান করা : বান্দা মহান আল্লাহর রাস্তায় গোপনে দান করলে আল্লাহ তা'আলা তা বেশি পছন্দ করেন। যদিও অন্যদের দান-সাদাক্বায় উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যেও দান করা যায়। তবে গোপনে করার মধ্যে বেশি তাক্বওয়া পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ﴾

"যদি তোমাদের দান-সাদাক্বাহ্গুলো প্রকাশ্যে করো, তাহলে তা-ও ভালো, তবে যদি গোপনে অভাবীদের দাও, তাহলে তোমাদের জন্য এটিই বেশি ভালো। এভাবে তোমাদের অনেক গুনাহ নির্মূল হয়ে যায়। আর তোমরা যা কিছু করে থাকো, আল্লাহ অবশ্য তা জানেন।"[৩৪]

তাই নিজেদের পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সর্বদা গোপনে দান করা উত্তম।

মহান আল্লাহর পথ ছাড়া আর কাদের জন্য ব্যয় করবেন : আমাদের দায়িত্ববোধ থেকেই অনেক খরচ করতে হয়। তবে সেই খরচে কাকে প্রাধান্য দেব, সে ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে নির্দেশনা রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

﴿يَسْاَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ﴾

[৩১] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৯২।*
[৩২] *মুয়াত্তা মালিক- অধ্যায় : সাদাক্বাহ্, হা. ১৮৭৩।*
[৩৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৬৭।*
[৩৪] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৭১।*

"লোকেরা জিজ্ঞেস করছে, আমরা কী ব্যয় করব? জবাব দাও, যে অর্থই তোমরা ব্যয় করো না কেন, তা নিজেদের মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করো। আর যে সৎকাজই তোমরা করবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত হবেন।"[৩৫]

উল্লেখ্য, ফর্‌য সাদাক্বাহ্ তথা যাকাত ইত্যাদির কথা বলা হচ্ছে না। কারণ পিতা, মাতা, স্ত্রী-সন্তানদের যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে না। এর বাইরে আমরা আমাদের পরিবার-আত্মীয়-স্বজনের জন্য দায়িত্ব হিসেবেও যা কিছু খরচ করি, আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে আমাদের সাদাক্বার সওয়াব দেন।

মহান আল্লাহর পথে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যয় : পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَيَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ﴾

"তোমাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, আমরা মহান আল্লাহর পথে কী ব্যয় করব? বলে দাও, যা কিছু তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়।"[৩৬]

নিজের পরিবারের জন্য খরচ করার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা দান করতে বলা হয়েছে। এমনভাবে দান করা যাবে না যে নিজের পরিবারকে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সেই বান্দাদের সুনাম করেছেন, যারা দান-সাদাক্বাহ্ করার ক্ষেত্রেও ভারসাম্য রক্ষা করে। ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا﴾

"এবং যখন তারা ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না; বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।"[৩৭]

তাই খরচ করার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। এত বেপরোয়া খরচ করা যাবে না, পরে নিজেই মানুষের কাছে হাত পাততে হয়। আবার এত কৃপণতাও করা যাবে না, যার জন্য সব মহলে নিন্দিত হতে হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا﴾

"তুমি তোমার হস্ত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখ না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।"[৩৮]

খাজনার জমির ফসল থেকে ব্যয়

কেউ কেউ বলেছেন, 'যে জমিতে খাজনা আছে সে জমিতে ওশর নেই'।[৩৯] তবে সহীহ হলো– যে জমির খাজনা দিতে হয় সে জমি হতে উৎপাদিত শস্যের ওশর বা যাকাত আদায় করতে হবে। 'উমার ইবনু আব্দুল 'আযীয (রাহিমাহুল্লাহ-র)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

اَلْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ وَفِي الْحَبِّ الزَّكَاةُ.

'খাজনা হলো জমির উপর এবং যাকাত (ওশর) হলো ফসলের উপর'।[৪০]

পক্ষান্তরে খাজনার জমিতে ওশর দিতে হয় না মর্মে নিম্নোক্ত দলিল পেশ করা হয়ে থকে,

لَا يَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خِرَاجٌ وَعُشْرٌ.

'মুসলমানের উপর একই সাথে খাজনা ও ওশর একত্রিত হয় না'।[৪১]

ইমাম বায়হাক্বী (রাহিমাহুল্লাহ-র) উল্লিখিত হাদীসটিকে বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ উল্লিখিত হাদীসের বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনু আনবাসাহ্ হাদীস জাল করার দোষে দুষ্ট।[৪২]

উপসংহার

মহান আল্লাহর পথে ব্যয় এর এক অদৃশ্য প্রভাব আছে। অদৃশ্য থেকে বালা-মুসিবত দূর করে। এ কারণে যেকোনো বিপদ-আপদে সাদাক্বাহ্ করার কথা বলা হয়েছে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেছেন, বিপদ-আপদ প্রতিহতের ক্ষেত্রে সাদাক্বার বিশেষ প্রভাব আছে। এমনকি কোনো পাপাচার, জালিম কিংবা কাফিরও যদি সাদাক্বাহ্ করে, আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তার থেকে বিপদ দূর করে দেন। আর যুগ যুগ ধরে এটা পরীক্ষিত সত্য।[৪৩] ❑

---

[৩৫] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২১৫।*
[৩৬] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২১৯।*
[৩৭] *সূরা আল ফুরক্বা-ন : ৬৭।*
[৩৮] *সূরা আল বানী ইসরাঈল : ২৯।*
[৩৯] *ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ- মিয়াঁ নযীর হুসায়েন দেহলভী, (দিল্লী : ইদারা নূরুল ঈমান, ৪১২১ আজমীরী গেইট, ৩য় সংস্করণ ১৪০৯/১৯৮৮) ২/৮৩-৮৭।*
[৪০] *সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী- হা. ৭৭৪৬।*
[৪১] *সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী- হা. ৭৭৪৮।*
[৪২] *সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী- হা. ৭৭৪৮।*
[৪৩] *আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব- ১/৩৮।*

প্রবন্ধ

ইসলামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও অন্যান্য ধর্মের প্রতি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

–প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম*

ইসলাম শব্দটি "সালাম" বা "সিলম" মূল শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। সালাম অর্থ শান্তি। আর মুসলিম অর্থ শান্তিকামী মানুষ। স্রষ্টার আনুগত্যের উদ্দেশে মাথানত করার নাম "ইসলাম"।

ইসলামী শরিয়তের আলোকে ইসলাম হলো– সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আর মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, সামর্থবানদের কা'বাঘর তাওয়াফ করা এবং রামাযানের সিয়াম পালন করা। যারা এই সকল ফরয পালন করে তারাই মুসলিম।

ঈমান অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলামের পরিভাষায় ঈমান হলো– মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাস, ফেরেশ্‌তাদের উপর বিশ্বাস, সকল আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস, যুগে যুগে প্রেরিত সকল নবী-রাসূলের উপর বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস।

ঈমান হলো অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস, আর ইসলাম হলো বাহ্যিক 'আমলসমূহের নাম।

মু'মিন আর মুসলিম শব্দদ্বয় ব্যপকতায় উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। মুসলমান হয়েও মু'মিন নাও হতে পারে। যেমন- পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

"বেদুঈনরা বলে আমরা ঈমান আনলাম, বলো, তোমরা ঈমান আনোনি; বরং বলো, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি, কারণ ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি।"[৪৪]

একজন মানুষকে মু'মিন হিসেবে গণ্য করা হয়, যখন সে উপরোক্ত ছয়টি বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করবে। কারণ মুহাম্মাদ (ﷺ) ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন : "আল্লাহ, ফেরেশ্‌তা, আসমানী কিতাবসমূহ, নবী ও রাসূলগণ ও পরকাল এবং ভাগ্যের ভালোমন্দের বিশ্বাসের নাম ঈমান।"[৪৫]

মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে, উপাসনার যোগ্য কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই আল্লাহ ব্যতীত। সৃষ্টির সব কিছুই যিনি সৃষ্টি করেছেন, আসমান-যমীন এবং উভয়ের মাঝে সব প্রাণী ও বস্তুরও স্রষ্টা সেই আল্লাহ তা'আলা।

আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে একলাখ চব্বিশহাজার নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করেছেন। এর মাধ্যমে আসমানী রিসালাতের সমাপ্তি ঘটে।

মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে, নবী-রাসূলগণ মানুষ ছিলেন। অতি প্রাকৃতিক কিংবা অতি মানব ছিলেন না। নবী-রাসূলগণের কাউকে কাউকে আল্লাহ তা'আলা অলৌকিক শক্তি দিয়ে যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার এবং নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে পাঠিয়ে ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ যাদুবিদ্যার চরম উৎকর্ষের যুগে নবী মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে লাঠি দিয়ে সহায়তা করেছিলেন। ঐ সময়কার বড় বড় যাদুকররা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর লাঠির যাদুতে পরাজিত হয়ে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। 'ঈসা মসীহকে মু'জিযা দিয়েছিলেন চিকিৎসা শাস্ত্রের পণ্ডিতদের পরাজিত করার জন্য। কারণ 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) "কুম বি ইযনিল্লাহ" বলে মৃত ব্যক্তিকে যিন্দা করতে পারতেন, কুষ্ঠ রুগীর শরীর স্পর্শ করলে তা ভালো হয়ে যেত এবং তিনি জন্মান্ধ ব্যক্তির চোখে হাত বুলালে সে ব্যক্তি চক্ষুষ্মান হতো।

সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুল্লাহ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময় আরবী ভাষা ও সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। ওকায মেলায় সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হতো। সেই যুগের আরবী কবিতা এখনও বিদ্যমান। সেই পণ্ডিতদের যুগে সর্বকালের সেরা সাহিত্য আল কুরআন নাযিল হয়। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর জিবরা-ঈল মারফত আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযিল করেছেন। এই কুরআনে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে কুরআনের মতো কুরআন

* *আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

[৪৪] *সূরা আল হুজুরা-ত : ১৪।*

[৪৫] *সহীহ মুসলিম।*

অথবা একটি সূরা তৈরির, যা এখনও বহাল আছে। ঐ যুগের অনেক খ্যাতিমান কবি, কবিতা রচনা পরিত্যাগ করেন। কবি লাবিদসহ অনেক কবিই আল কুরআনকে মানুষের বাণী নয় বলে স্পষ্ট ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য যে, আল কুরআনের বিস্ময়কর বর্ণনাভঙ্গি, মনোমুগ্ধকর রচনাশৈলী, অত্যন্ত চমৎকার শব্দচয়ন, বিষয়বস্তুর আধিক্য ও আকর্ষণ, চৌদ্দশত বছর পরেও চিরন্তন মু'জিযাহ্ হিসেবে টিকে আছে। এর মধ্যে অত্যন্ত লক্ষণীয় হলো যার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে তাঁর নাম মাত্র চারবার পরিলক্ষিত হয়; পক্ষান্তরে অন্যান্য নবী রাসূল সম্পর্কে বা তাঁদের উম্মাতদের আলোচনা রয়েছে বহুগুণ বেশি। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত নবী হলেন মূসা (আলাইহিস সালাম)। ১৩৬ বার তাঁর নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ৮৩ স্থানে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর উম্মাতের প্রসঙ্গ এসেছে। নবী ইব্‌রা-হীম-এর প্রসঙ্গ এসেছে ৬৯ বার, 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর নাম ২৫ বার আর তাঁর মা মারইয়াম-এর নাম এসেছে ৩৪ বার। যদিও ২৫জন নবীর প্রসঙ্গ এসেছে কিন্তু অনেকের নাম ছাড়া বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। যে সকল নবী সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে তাদের সংখ্যা ১১/১২জন। নবীদের প্রত্যেকে একত্ববাদের তালিম প্রচার করেছেন। মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর নামে একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে। ইসহাক, ইসমা'ঈল, ইয়াকুব, ইউসূফ, হূদ, সালেহ, ইদরীস, আইয়্যুব এবং নূহের প্রসঙ্গ সবিস্তারে একাধিকবার আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে মানব জাতির পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রসঙ্গও আলোচিত হয়েছে, তবে ইয়াস (আলাইহিস সালাম), যুলফিকর-এর শুধু নামই এসেছে এবং এদের সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

ইসলাম মূলতঃ সকল নবী-রাসূলেরই ধর্ম। ইসলাম হলো ফিতরাতের ধর্ম। ফিতরাত অর্থ সুন্দর ও স্বাভাবিক। সব শিশুই ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে, পিতামাতা ও পরিবেশের কারণে সে ইয়াহুদী খ্রিষ্টান অথবা অগ্নিপূজক হয়ে যায়। "নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট মনোনীত একমাত্র দীন (ধর্ম)।"[৪৬]

"তারা কি চায় আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন? অথচ আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সবই স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পন করেছে এবং তাঁর দিকেই তারা প্রত্যানীত হবে।"[৪৭]

"কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"[৪৮]

"আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার রব প্রদত্ত আলোতে রয়েছে সে কি তার সমান যে এরূপ নয়?"[৪৯]

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বশেষ নবী ও রাসূল। ইসলাম সকল নবী-রাসূলের উপর ঈমান আনতে তাকীদ দিয়েছে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সব নবী-রাসূলের মধ্যে শেষ নবী। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– "মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নয়; বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"[৫০]

অতীতের সকল নবী ও রাসূল ছিলেন গোত্র বিশেষ ও সম্প্রদায় বিশেষের জন্য, কিন্তু শেষ নবীকে কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান : "বলো, হে মানব! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী।"[৫১]

ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যাদি পেতে হলে ইসলামের শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে জানা অপরিহার্য। শেষ নবীকে ইতিহাসের বিচারে দেখার আগে পবিত্র কুরআনের আলোকে দেখা উচিত। কারণ তিনি ছিলেন চলমান কুরআন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– "শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের, তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত। তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।"[৫২] "তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।"[৫৩]

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, তাঁর সহচরগণ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, আল্লাহর অনুগ্রহ আর সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকূ' ও সাজদায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সাজদার প্রভাব প্রতিভাত হবে, তাওরাতেও তাদের বর্ণনা এইরূপ এবং ইঞ্জিলেও তাদের বর্ণনা এইরূপই।"[৫৪]

---

[৪৬] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৯।*
[৪৭] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৮৩।*
[৪৮] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৮৫।*
[৪৯] *সূরা আয্ যুমার : ২২।*
[৫০] *সূরা আল আহ্যা-ব : ৪০।*
[৫১] *সূরা আল আ'রাফ : ১৫৮।*
[৫২] *সূরা ইয়া-সীন : ২-৪।*
[৫৩] *সূরা আল ক্বলম : ৪।*
[৫৪] *সূরা আল ফাত্হ : ২৯।*

অন্যান্য ধর্মের প্রতি ইসলামের মহানুভবতা : আসমানী কিতাবের অনুসারী খ্রিষ্টান ও ইহুদীগণকে সম্মানসূচক সম্বোধন করে বলা হয়েছে– ইয়া আহলাল কিতাব, অর্থাৎ- হে আসমানী কিতাবের অনুসারীগণ! খ্রিষ্টান, ইয়াহুদী ও অন্যান্য ধর্মের প্রতি ইসলামের রীতি-নীতি উদার। যে সকল মুসলিম দেশে অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে, অথবা যে সকল দেশে মুসলমানরা এখনও পৌঁছতে পারেনি ঐসব দেশের অমুসলিমদের সাথেও ইসলামের উদার নীতি ও মহানুভবতা সব যুগেই প্রশংসিত হয়েছে। 'আক্বীদাহ্ বিশ্বাস বা ইসলামী রাষ্ট্রের পরিপন্থিদের সাথেও ইসলাম ন্যায়-নীতি ও ইনসাফ সমভাবে প্রতিষ্ঠা করে আসছে।

মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আল্লাহ তা'আলা শেষ নবী করে পাঠিয়েছেন, তিনি পূর্বের অন্যান্য সব নবী-রাসূলদের সত্যায়ণকারী। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিকট কুরআন প্রেরিত হয়েছে যা পূর্বের আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি দৃঢ় সমর্থন যোগায়। পূর্বের প্রেরিত নবীদের উপর ঈমান না আনলে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ হয় না। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন :

"তোমরা বলো, আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইব্‌রা-হীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরগণের উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে মূসা, 'ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেয়া হয়েছে আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না; বরং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পনকারী।"[৫৫]

মূসা (আলাইহিস সালাম) প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন : "নিশ্চয় আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি এতে আছে পথ-নির্দেশ ও আলো; নবীগণ যারা আল্লাহর অনুগত ছিল তারা ইহুদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিত, আরও বিধান দিত রব্বানীগণ (রব্ব-এর জ্ঞানে জ্ঞানী) এবং বিদ্বানগণ কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল এর সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করো না; বরং আমাকেই ভয় করো এবং আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করো না। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।"[৫৬]

'ঈসা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : "মারইয়াম তনয় 'ঈসাকে তাঁর পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে ওদের পরপরই পাঠিয়েছি, তাকে ইঞ্জিল দিয়েছি যাতে রয়েছে পথনির্দেশ ও আলো এবং তাওরাতের প্রতি সমর্থন আর মুত্তাক্বীদের জন্য পথের আলো ও উপদেশ।"[৫৭]

ইহুদী-খ্রিষ্টান উভয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে, কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : বলো, ওহে কিতাবীগণ! তাওরাত, ইঞ্জিল ও যা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে, তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোনো ভিত্তি নেই। তাই মুসলমানগণ অন্যান্য নবীদের ন্যায় মূসা ও 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) নবীদ্বয়ের নবুওয়াতকেও স্বীকার করেন। তাঁদের মর্যাদাকে স্বীকার করেন। 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে তার উপর আরোপিত ভিত্তিহীন অভিযোগ থেকে পবিত্র মনে করেন। তাদের রিসালাত অস্বীকার করাকে কুফ্‌রী কাজ মনে করেন। অতএব খ্রিষ্ট-ধর্ম বা ইহুদী-ধর্ম সম্পর্কে মুসলমানদের মনে কোনো পক্ষপাতিত্ব বা সাম্প্রদায়িকতা ও হিংসা বিদ্বেষ নেই। অন্য কোনো ধর্ম বা ধর্ম প্রবর্তকের উপরও ইসলামে কোনো আক্রমণাত্মক সমালোচনা নেই। কারণ ইসলাম শান্তির ধর্ম।

পৃথিবীতে যখন মানবজাতি জ্ঞান বিজ্ঞান এবং সভ্যতা সংস্কৃতিতে উন্নতি করছে তখনই মানুষের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়েছে, হাজার বছরের সংস্কৃতি মুহূর্তেই বিলীন হয়েছে। যেমনটি বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে ঘটে চলেছে।

যুদ্ধ কোনো দিনই শান্তি প্রতিষ্ঠা করেনি। কেবল পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ বেড়েছে। আধিপত্য বিস্তার আর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লড়াই যুগে যুগে কোটি লোকের জীবনপাত করেছে, সম্পদ স্বজন ভিটেমাটি হারিয়ে পৃথিবীকে জাহান্নামে পরিণত করা হয়েছে। তাই শেষ নবী যিনি বিশ্ববাসীর জন্য শান্তি ও রহমাতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন, আর সেজন্যই ইসলামে শান্তি প্রতিষ্ঠাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। যুদ্ধের চেয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপর ইসলামে জোর দেয়া হয়েছে।

তবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে স্বদেশ ও 'আক্বীদাহ্ বিশ্বাস রক্ষার জন্য আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি রয়েছে। ইসলামের শান্তির আহ্বানে শত্রু পক্ষ সাড়া না দিলে এবং

[৫৫] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৩৬।*
[৫৬] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৪৪।*
[৫৭] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৪৬-৪৭।*

যুদ্ধ ছাড়া কোনো গত্যান্তর না থাকলে যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ইসলাম শান্তির ধর্ম কেননা মহান আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহের একটি হলো সালাম বা শান্তি। মুসলিমরা তাদের প্রাত্যহিক উপাসনা ও সালাত আদায়কালে বিশেষ করে তাশাহ্‌হুদের সময় বলে থাকেন।

হে নবী! তোমার উপর শান্তি রহমাত ও বারাকাত বর্ষিত হোক, আমাদের উপর এবং মহান আল্লাহর নেক বান্দাগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। সালাতের সমাপ্তি ঘটে সালাম বা শান্তি কামনার মধ্য দিয়েই : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহ।

পবিত্র কুরআনে জান্নাতকে দারুস সালাম বলা হয়েছে। প্রভুর দরবারে শান্তির আবাস রয়েছে তাদের জন্য। মুসলিমরা পারস্পরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের সময়ও বলে থাকেন আস্-সালামু 'আলাইকুম। তোমাদের সবার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে– ফেরেশ্‌তাগণ ভালো মানুষের জান কবজের সময় শান্তি কামনা করে বলে থাকেন– তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফলস্বরূপ জান্নাতে প্রবেশ করো।

যুদ্ধের ময়দানেও শান্তি প্রতিষ্ঠার আদেশ দেয়া হয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে শত্রু পক্ষ শান্তির প্রস্তাব দিলে শান্তির পথে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ রয়েছে ইসলামে। মুসলিম সৈনিকদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সর্বদা নির্দেশ দিতেন– শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ব্যর্থ হলেই কেবল তরবারীর ব্যবহার। পরাজিত প্রতিপক্ষের নিহত সৈনিকদের মরদেহ বিকৃত করা যাবে না। ঘরবাড়ি ধ্বংস করা যাবে না, কাউকে তাদের ধর্মত্যাগে বা ইসলামে দীক্ষিত করতে জবরদস্তী ও বলপ্রয়োগ করা যাবে না।

ইসলাম অন্যান্য ধর্মের অনুসারী সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলাপ আলোচনা ও সংলাপ বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

"বলো, হে মুহাম্মদ, ওহে আহলে কিতাব (খ্রিষ্টান ও ইয়াহুদী) সম্প্রদায়! তোমরা সে কথায় এসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো 'ইবাদত না করি, কোনো কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলো তোমরা সাক্ষী থাকো অবশ্যই আমরা মুসলিম।"[৫৮]

"দ্বীন বা ধর্ম বিষয়ে মহানুভবতা প্রদর্শন ও উদারনীতি গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে। দীন বিষয়ে জোর জবরদস্তি নেই। সত্যপথ ভ্রান্ত হতে সুস্পষ্ট হয়েছে।"[৫৯]

ইসলামের নবী মুহাম্মদ (ﷺ) এবং মুসলিম শাসকবৃন্দ বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদার খলীফাগণের ইসলামী হুকুমতে প্রজা সাধারণের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি বহাল ছিল। অনেক বিচারক অমুসলিমদের অনুকূলে রায় দিয়েছেন। ইসলাম ও মুসলিমদের উদারতার কিছু বাস্তব নমুনা নিম্নে বর্ণিত হলো–

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে মাক্কার কাফির-মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর বেশ কিছু কঠিন শর্ত চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তার একটি ছিল এমন যে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দল থেকে মাক্কার কুরায়শদের কাছে কেউ এলে কুরায়শরা তাকে ফেরত পাঠাবে না; কিন্তু মাক্কার কুরায়শদের কেউ মাদীনায় গেলে তাকে অবশ্যই ফেরত পাঠাতে হবে। তাদের এই নিপীড়নমূলক শর্ত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই মেনে নিয়েছিলেন। সেই ঘটনার পরপরই আবূ জন্দল নামক একজন মুসলিম মাদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবারে অভিযোগ করল যে, কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সে চলে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বলেছিলেন হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী আমি তোমাকে ফেরত পাঠাতে বাধ্য। আবূ জন্দল বলেছিলেন : ফিরে গেলে ওরা আমায় আরও অত্যাচার করবে। রাসূল (ﷺ) বলেছিলেন : সবর করো, আশাবাদী হও। তোমার ও তোমার মতো অন্যান্যদের জন্য আল্লাহ তা'আলা কিছু একটা করবেন। নিশ্চয় উত্তরণের পথ বেরিয়ে আসবে। আমরা সবেমাত্র কুরায়শদের সংগে একটি চুক্তি সই করেছি। মহান আল্লাহর নামে আমরা শপথ করেছি, তারাও করেছে। আমি তাদের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। এরপর আরও ব্যক্তি ও পরিবার মাদীনায় আসেন কিন্তু কাউকেই রাসূল (ﷺ) আশ্রয় দেননি; বরং সবাইকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

এটা শুধু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ব্যক্তিগত উদারতা নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল ইসলামেরই উদারতা।

---

[৫৮] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৬৪।*
[৫৯] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ২৫৬।*

মাক্কা বিজয়ের দিন বিনা রক্তপাতে মাক্কা মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মাক্কাবাসীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন : আমার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? আমি তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করব? তারা বলেছিল, আপনি মহান, আপনার বংশের লোকেরাও সৎ ও আদর্শবান। রাসূলুল্লাহ বলেছিলেন : "যাও, আজ তোমরা সকলেই স্বাধীন ও মুক্ত। আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও তোমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন।"

খায়বর যুদ্ধে ইহুদীদের সংগে মুসলিমরা যুদ্ধ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ মুসলিম মুজাহিদদের বলেছিলেন : আহলে কিতাবদের গৃহে তোমরা অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করবে না। মাদীনার চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ইহুদী ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সংগে রাসূল (ﷺ) অত্যন্ত শোভন আচরণ করেছেন, তাদের সুখে-দুঃখে উপস্থিত থেকেছেন, তাদের বিপদের মুহূর্তে সমবেদনা জানাতেন, বিয়ে শাদী ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। চুক্তি মাফিক অন্যান্য কাজ কর্ম এমনকি ধার কর্জ, সম্পদ বন্ধক রেখে ইহুদীদের কাছ থেকে নগদ অর্থ গ্রহণ এসব কাজে কোনো বাধা ছিল না। মদীনা শহরের প্রতিরক্ষা ব্যাপারে সব ধর্মের লোকের সার্বিক আন্তরিকতা ছিল।

সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে অন্যান্য ধর্মের মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতার সংগে নির্দ্বিধায় বসবাস করতেন। এমনকি বিভিন্ন ধর্মের লোকদের জাগতিক কর্মক্ষেত্র, হাট-বাজার, ব্যবসাকেন্দ্র এমনকি চাষবাস সবই পাশাপাশি চলত এতে কোনো পক্ষেরই কোনো অসুবিধে হতো না। আহলে কিতাবের যবেহ করা পশু, রান্না করা খাবার মুসলমানদের জন্য হালাল যদি তা শরিয়ত সিদ্ধ হালাল বস্তু হয়। তাদের মেয়েদের সাথে মুসলিমদের ছেলেদের বিয়ে সিদ্ধ। স্বেচ্ছায় তারা মুসলিম না হলেও ঐ অবস্থাও বৈধ। অর্থাৎ- খ্রিষ্টান ইয়াহুদ নারীগণ মুসলমানদের স্ত্রী হিসেবে বিবাহ বৈধ।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা যেন অস্বস্তি অনুভব না করে সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবায়ে কিরামকে সতর্ক ও সজাগ থাকতে বলতেন। রাষ্ট্রের উন্নয়নে সকলেই আন্তরিক হতেন, শত্রুপক্ষের কেউ যেন বাইরে থেকে আক্রমনে সাহসী না হয় সেজন্য আন্তধর্মীয় ঐক্য ও শক্তিশালী সমাজ গঠনই ছিল মদীনা সনদের মূল লক্ষ্য। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের সংগে মুসলমানদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না; বরং উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পায়।

খলিফা 'উমার (رضي الله عنه) সিরিয়ায় একটা গীর্জা পরিদর্শনকালে সালাতের সময় উপস্থিত হয়। গীর্জার পাদ্রী গীর্জায় সালাত আদায়ের অনুরোধ জানান, 'উমারও তথায় সালাত আদায়ের মনস্থ করলেন কিন্তু হঠাৎ তিনি তথায় সালাত আদায়ে অপারগতার কথা বলেন, তিনি আশংকা করলেন যে, তিনি গির্জায় সালাত আদায় করলে মুসলমানরা দাবী করতে পারেন যে এটা আমাদের মাসজিদ। কেননা খলীফা এখানে সালাত আদায় করেছেন। হয়ত ভবিষ্যতে তারা খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে বলপূর্বক তা দখল করে মসজিদে রূপান্তরিত করবে। নিঃসন্দেহে এটা 'উমার (رضي الله عنه)-এর মহানুভবতা ও দূরদর্শিতা।

'উমার (رضي الله عنه) সিরিয়া সফরকালে একদল খ্রিষ্টান যুবক বিশেষ ধরনের তরবারী খেলার মাধ্যমে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। সাধারণতঃ তারা বাদশাহ বা রাষ্ট্রপ্রধানকে ঐভাবে অভ্যর্থনা জানাতে অভ্যস্ত ছিল। 'উমার (رضي الله عنه) আবূ ওবায়দাকে আদেশ দিলেন ওদের ঐসব বন্ধ করো। আবূ 'উবায়দাহ্ আরয করলেন : খলীফাতুল মুসলেমীন! ওরা আপনাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাচ্ছে, যদি তাদেরকে নিষেধ করেন হয়ত তারা ভাববে আপনি তাদের ঘৃণা করেন এবং খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি আপনি ভেঙ্গে দিবেন। 'উমার (رضي الله عنه) বললেন : "তাহলে ওরা যা করছে তা করতে দাও। 'উমার ও ইবনু 'উমার আবূ 'উবায়দার কথা ও পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবে।"

খলীফা 'উমার খ্রিষ্টানদের অভিযোগের ভিত্তিতে বানূ তাগলিব গোত্রের শাসক ওয়ালিদ ইবনু 'উক্ববাকে পদচ্যুত করেছিলেন।

একদা 'উমার (رضي الله عنه)-এর কাছে এক দরিদ্র অন্ধ ব্যক্তি আসলেন। 'উমার তাকে বললেন : তুমি আহলে কিতাবের কোনো সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত? লোকটি জবাব দিলো আমি ইহুদী। তুমি কেন এসেছ? আমি জিযিয়া দিতে অপারগ। 'উমার (رضي الله عنه) তার হাত ধরে বাসায় নিয়ে যান এবং ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে তাকে সাহায্য করলেন আর বায়তুল মালের মুহাফিজকে লিখে পাঠালেন এই লোকটির প্রতি যথাযোগ্য ইনসাফ করতে পারিনি, বৃদ্ধ বয়সে সে অর্থাভাবে রয়েছে, এই লোক এবং তার মতো যে কোনো অভাবীদের প্রতি সুনজর দিবে। লোকটির জিযিয়া মওকুফ করে দেন 'উমার (رضي الله عنه)।

ইবনু 'উমার (رضي الله عنه)-এর বর্ণনায় মুজাহিদ বর্ণনা করেন : ইবনু 'উমারের বাড়িতে খাসি জবাই হয়েছে। ইবনু 'উমার কাজের লোকটিকে বললেন, গোস্ত কাটা বাছা শেষ হলে নিকট পড়শী ইহুদী ভাইকে আগে কিছু দিবে

অতঃপর অন্যান্য পড়শীদের দিয়ে বাকিটা রান্না করবে। তিনি এ কথাটি পুনঃ পুনঃ তিন বার বললেন। উপস্থিত একজন বললেন : একই কথা কতবার বললেন? তিনি উত্তরে বললেন : রাসূল (ﷺ) পড়শীদের ব্যাপারে এত জোর দিতেন যে, আমাদের মনে হত পড়শীরা বুঝি উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের সম্পদের হিস্যা পাবেন।

খলীফা 'উসমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একজন খ্রিষ্টান কবি আবূ যুবাইদকে অন্যান্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন।

ইসলামের বিজয়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বিজিত অঞ্চলের অমুসলিমরা পারস্য ও রোমান শাসকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলিম শাসকদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রথমত তাদের কর্তৃত্ব মেনে চলতেন, অল্প কিছু দিন পর ইসলামের উদারনীতি ও মুসলমনাদের মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে তারা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এভাবেই পৃথিবীর বহুদেশ ও জনপদে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে।

সিরিয়ার খ্রিষ্টান নাগরিকরা তৎকালীন শাসক আবূ 'উবায়দাহ্ আল জাররাহকে লেখা এক পত্রে লিখেন, "হে মুসলিম সেনাপতি! রোমান শাসকদের চেয়ে মুসলমানগণ আমাদের বেশি প্রিয়, যদিও রোমানগণ আমাদের ধর্মের অনুসারী; কেননা আপনারা আমাদের প্রতি অধিক সহানুভূতিশীল ও অধিক সংবেদনশীল। আপনাদের শাসনাধীনে আমরা নিপীড়নের শিকার হই না। রোমান শাসকরা আমাদের জানমালের প্রতি দখলদারিত্ব কায়েম করা ছাড়া আর কিছুই করতো না। সুতরাং মুসলিম শাসন ও নেতৃত্বই আমাদের নিকট অধিক কাম্য"।

হেমসের খ্রিষ্টানগণ তাদের শহরের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়েছিল যেন হেরাকেল এর অত্যাচারী সৈন্যরা তথায় প্রবেশ করতে না পারে। পক্ষান্তরে হেমসবাসী মুসলিম নেতৃবৃন্দকে পত্র লিখে আহ্বান জানিয়েছিল আমরা আপনাদের অভিযানকে স্বাগত জানাব। যথাশীঘ্র রোমের নির্যাতন থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিন।

উত্তরের বানী গাসসান সম্প্রদায় দীর্ঘদিন খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী ছিল, তারাও রোমান প্রভুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল। তাই ইসলামী রাষ্ট্রের ন্যায়-নীতি ও মুসলিম শাসকদের সাদাসিধে জীবনযাত্রা তাদের মুগ্ধ করেছিল বলে তারা রোমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মুসলিম শাসকবৃন্দের নিকট তাদেরকে রক্ষা করার আবেদন জানিয়েছিল।

এদিকে কাদেসীয়া যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ে পারস্যের অধীনস্থ বেশক'টি ছোট ছোট দেশের জনগণ মুসলিমদের কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ পূর্বক ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম হয়েছিল। এদের অধিকাংশ ফুরাত তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী। ঐ অঞ্চলের কিছু সংখ্যক জনগণ ইতিপূর্বেও ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে ১৩ হিজরি সালে 'জসর' নামক এক যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যরা পারস্য বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লে বানী তাঈ গোত্রের খ্রিষ্টান জনগণের সহায়তায় তারা জানে বেঁচে সরে পড়েছিলেন। শুধু মুসলিমদের নীতি ও আদর্শ এবং অন্য ধর্মের প্রতি উদার নীতি ও মহানুভবতা ইসলাম বিস্তারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সহায়ক হয়েছে।

এদিকে মিশরের কিবতী জনগোষ্ঠী ইসলামের অগ্রাভিযানে মুসলিম সৈন্যদের স্বাগত জানিয়েছিল কেননা মিশরের তৎকালীন মুসলিম শাসক 'আম্‌র ইবনুল 'আস-এর উদারনীতির ফলে তারা রোমান পরাশক্তির নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি পায়। এছাড়া কিবতীরা নিজ দেশে ধর্মীয় হানাহানির শিকার হয়ে যুগের পর যুগ বৈষম্যের শিকার ছিল। 'আম্‌র ইবনুল 'আস কিবতীদের ইসলাম ধর্মে জোর পূর্বক দীক্ষিত করেননি; বরং তিনি তাদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তখন থেকে অদ্যাবধি কোনো মুসলিম শাসক মিশরের কিবতীদের বলপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করেননি। মানুষকে ধর্ম পালনে স্বাধীনতা দেয়াই বড় কথা। অন্তর থেকে কোনো ধর্ম গ্রহণ না করা হলে তা টেকসই হয় না।

মুসলিমরা পারস্য বিজয়কালে খুব বড় ধরনের বাধার সম্মুখীন হননি। কারণ পারস্যের অত্যাচারি শাসকরা প্রজা সাধারণের উপর নির্যাতন চালিয়ে জনগণের ভালোবাসা হারিয়ে বসেছিল।

ফল কথা হলো ইসলামের সব যুগেই মুসলিম শাসকগণ খ্রিষ্টান ধর্মসহ অন্যান্য ধর্মের নাগরিকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেননি।

'উমাইয়্যাহ্ 'আব্বাসী সবযুগেই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অনেক অমুসলিম ছিলেন। তারা শুধু ধর্মের কারণে মর্যাদা হারিয়েছেন এমন কোন নযীর নেই। গ্রীক ভাষা হতে আরবী ভাষায় যে সকল গ্রন্থ অনুদিত তার সিংহভাগ করেছেন অমুসলিম পণ্ডিতগণ। ভারতবর্ষে সাতশ বছরের মুসলিম শাসনামলে হিন্দু-খ্রিষ্টান জনগণ রাজা বাদশাদের কাছ থেকে আনুকুল্য পেয়েছেন সে কথা সবার জানা। ❑

মহান আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কতিপয় জাতির ইতিকথা

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[পর্ব- ০১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষ ও জিন্ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন 'ইবাদত করার জন্য। পবিত্র কুরআনে বিঘোষিত হয়েছে–

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

অর্থ : "আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন্ এবং মানুষকে এ জন্যেই যে, তারা কেবল আমার 'ইবাদত করবে।"[৬০]

'ইবাদত আরবী শব্দ আবদ থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো– আনুগত্য, দাসত্ব, গোলামি কিংবা বন্দেগী করা। সুতরাং 'ইবাদত মানে হচ্ছে বন্দেগী বা গোলামি করা। আল কুরআনে এই শব্দটি বিভিন্নভাবে মোট ২৭৬ বার উল্লেখিত হয়েছে।

ইসলামী পরিভাষায় দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজে-কর্মে মহান আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলাকে 'ইবাদত বলা হয়। কিন্তু যদি মহান আল্লাহর গোলামি করার ক্ষেত্র ব্যত্যয় হয়; প্রেরিত নবী-রাসূলদের আনুগত্যে অনীহা কিংবা অস্বীকার করা হয় সেক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। উপর্যুপরি অসন্তুষ্টির ফলশ্রুতিতে গযব নাযিল হয়।

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য সূরাতে বিভিন্ন জাতির ধ্বংসের বিষয়ে জানা যায়। যখন কোনো জাতি মহান আল্লাহর প্রেরিত নবীকে অস্বীকার করেছে নিষ্পাপ নবীদের অবজ্ঞা কিংবা হয়রানি করেছে তখনই স্বাভাবিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। জলে স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। কুরআনুল কারীমে উল্লিখিত হয়েছে–

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

অর্থ : "মানুষের কৃতকর্মের দরুণ স্থলে ও সাগরে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে; ফলে তিনি তাদেরকে তাদের কোনো কোনো কাজের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।"[৬১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ ধরনের বিপর্যয়ের মুখোমুখি করে মানবজাতিকে হুঁশিয়ার করে দেন। আমরা নিম্নে পবিত্র কুরআনে বিধৃত ঘটনাবলীর আলোকে ধ্বংসপ্রাপ্ত কতিপয় জাতিসমূহের বিষয়ে যৎসামান্য আলোকপাত করতে প্রয়াস পাব।

মহান আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশ্বের প্রধান ছয়টি জাতির কাহিনী কুরআন কারীমের বিশেষ বাচনভঙ্গিতে সূরা হূদ-এ বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনের মাধ্যমেই জগদ্বাসী তাদের খবর জানতে পেরেছে। যাতে মুসলিম উম্মাহ ও পৃথিবীবাসী তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। উক্ত ৬টি জাতি হলো– ক্বওমে নূহ্, 'আদ, সামূদ, লূত, মাদইয়ান ও ফেরাউন।

১. আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে নূহ্ (আলাইহিস সালাম) পর্যন্ত দশ শতাব্দীর ব্যবধান ছিল। যার শেষদিকে ক্রমবর্ধমান মানবকুলে শির্কের আবির্ভাব ঘটে এবং তা বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে তাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহ তা'আলা নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-কে নবী ও রাসূল করে পাঠান। তিনি সাড়ে নয়শত বছরের দীর্ঘ বয়স লাভ করেছিলেন এবং সারা জীবন পথভোলা মানুষকে হিদায়াতের পথে আনার জন্য দিন রাত দাওয়াহ্ ও তাবলীগের কাজে অতিবাহিত করেন। কিন্তু তাঁর ক্বওম তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। তাঁর দাওয়াতে বিরক্ত হয়ে তারা তাঁকে দেখলেই পালিয়ে যেত। কখনো কানে আঙ্গুল দিত। কখনো তাদের চেহারা কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলতো। তারা তাদের হঠকারিতা ও জিদে অটল থাকত এবং চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত। তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত অভিব্যক্তি কুরআন মাজীদে উক্ত হয়েছে যে,

﴿قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ﴾

অর্থ : "তারা বলল, 'হে নূহ্! তুমি আমাদের সাথে ঝগড়া করেছ, খুব বেশি বেশি ঝগড়া করেছ, এখন যার ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছ তা আমাদের কাছে নিয়ে এসো, ('আযাব অবতীর্ণ করিয়ে আমাদেরকে ধ্বংস করে দাও!) যদি তুমি সত্যবাদি হও'।"[৬২]

তাদের অনড় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাবের কারণে আল্লাহ তা'আলা ওয়াহী নাযিল করেন,

---

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[৬০] সূরা আয্ যা-রিয়া-ত : ৫৬।

[৬১] সূরা আর্ রূম : ৪১।

[৬২] সূরা হূদ : ৩২।

﴿وَأُوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

অর্থ : "তোমার ক্বওমের যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে, তারা ব্যতীত আর কেউ ঈমান আনবে না। অতএব তুমি ওদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হয়ো না।"[৬৩]

এভাবে মহান আল্লাহর ওয়াহী মারফত তিনি যখন জেনে নিলেন যে, এরা কেউ আর ঈমান আনবে না; বরং কুফ্‌র, শির্‌ক ও পথভ্রষ্টতার উপরেই জিদ করে থাকবে, তখন নিরাশ হয়ে তিনি দয়াময় প্রভুর শেখানো দু'আ করলেন–

﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ○ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾

"হে প্রভু! পৃথিবীতে একজন কাফের গৃহবাসীকেও তুমি ছেড়ে দিয়ো না। যদি তুমি ওদের রেহাই দাও, তাহলে ওরা তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং কেবল দুষ্কৃতিকারী ও অবিশ্বাসীই জন্ম দিতে থাকবে।"[৬৪] নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর এই দু'আ আল্লাহ তা'আলা সাথে সাথে কবুল করেন। তাঁকে নৌকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়, যা না তিনি চিনতেন, না তৈরি করতে জানতেন। আর সে কারণেই আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন,

﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾

অর্থ : "তুমি নৌকা তৈরি করো আমাদের চোখের সম্মুখে ও আমাদের ওয়াহী অনুসারে।"[৬৫] এর দ্বারা বুঝা যায়. যে, নৌকা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ ও নির্মাণ কৌশল জিবরীল (আলাইহিস সালাম) নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। নদীবিহীন মরু এলাকায় বিনা কারণে নৌকা তৈরি করাকে পণ্ডশ্রম ও নিছক পাগলামি বলে– "ক্বওমের নেতারা নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-কে ঠাট্টা করত"[৬৬] এ ব্যাপরে নূহ্ (আলাইহিস সালাম) বললেন, "তোমাদের ঠাট্টার জবাব সত্ত্বর তোমরা জানতে পারবে"[৬৭]। দীর্ঘ দিন ধরে নৌকা তৈরি শেষ হবার পরেই মহান আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা নেমে আসে এবং নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-কে নির্দেশ দেওয়া হয় কেবল তাঁর পরিবারসহ ঈমানদার নর-নারীকে নৌকায় তুলে নিতে। যাদের সংখ্যা অতীব নগণ্য ছিল[৬৮]। এর সঠিক সংখ্যা কুরআন বা হাদীসে উল্লেখিত হয়নি। নূহের স্ত্রী ও লূত্বের স্ত্রী স্ব স্ব স্বামীর নবুওয়াতের উপরে বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে খেয়ানত করেছিল বলে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। নবীদের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও কুফ্‌রীর কারণে তারা জাহান্নামবাসী হয়েছেন। সম্ভবত মহাপ্লাবনের সময় নূহের স্ত্রী জীবিত ছিলেন না। সে কারণ গযবের ঘটনা বর্ণনায় কেবল তার পুত্রের কথা এসেছে।

পর্বতসদৃশ তরঙ্গমালার মধ্য দিয়ে তা (নৌকা) তাদেরকে নিয়ে বয়ে চলল। তখন নূহ্ তার পুত্রকে- যে তাদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল- ডাক দিয়ে বলল,

☝ "হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ করো, কাফিরদের সঙ্গে থেক না।"[৬৯]

☝ "সে (অর্থাৎ- নূহের পুত্র) বলল, 'আমি এক্ষুণি পাহাড়ে আশ্রয় নেব যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে।' নূহ্ বলল, 'আজ আল্লাহর হুকুম থেকে কোনো কিছুই রক্ষা করতে পারবে না, অবশ্য আল্লাহ যার প্রতি দয়া করবেন সে রক্ষা পাবে।' অতঃপর ঢেউ তাদের দু'জনার মাঝে আড়াল করল আর সে ডুবে যাওয়া লোকেদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল।"[৭০] এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ওহে নূহ্! সে (পুত্র) তো তোমার পরিবারের লোক নয়, তার আচার আচরণ অসৎ, কাজেই যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আমার কাছে আবেদন করো না, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি যেন মূর্খদের মধ্যে শামিল না হও।"[৭১] তখন নূহ্ (আলাইহিস সালাম) যা করেছেন সে জন্য ভীষণ লজ্জিত হলেন এবং বিনম্রচিত্তে বললেন,

﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

অর্থ : "হে আমার রব! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে যাতে আপনাকে অনুরোধ না করি, এ জন্য আমি

---

[৬৩] সূরা হূদ : ৩৬।
[৬৪] সূরা নূহ্ : ২৬-২৭।
[৬৫] সূরা হূদ : ৩৭; আল মু'মিনূন : ২৭। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার চক্ষু রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 'আক্বীদাও তাই। এ আয়াতে প্রতিভাত হয় যে, নূহ্ (আলাইহিস সালাম) সর্বপ্রথম নৌকা তৈরি করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা নৌকা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও নির্মাণ কৌশল ওয়াহীর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছিলেন।
[৬৬] সূরা হূদ : ৩৮।
[৬৭] সূরা হূদ : ৩৯।
[৬৮] সূরা হূদ : ৪০।
[৬৯] সূরা হূদ : ৪২।
[৭০] সূরা হূদ : ৪৩।
[৭১] সূরা হূদ : ৪৬।

আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।"[৭২] উক্ত আয়াতের আলোকে প্রতিভাত হয় যে, কাফির ও মুশরিক সন্তান বা কোনো নিকটাত্মীয়ের মাগফিরাতের জন্য মহান আল্লাহর নিকটে দু'আ করা জায়িয নয়। দু'আকারীর কর্তব্য হচ্ছে যার জন্য ও যে কাজের জন্য দু'আ করা হবে তা জায়িয, হালাল ও ন্যায়সঙ্গত কী না, তা জেনে নেয়া। সন্দেহজনক কোনো বিষয়ের জন্য দু'আ করা নিষিদ্ধ। যারা মহান আল্লাহর হুকুম-আহকাম মানবে রাসূলের আনুগত্য করবে তারাই নাজাতের হক্বদার।

নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর দাওয়াতে তাঁর ক্বওমের হাতেগোনা যেসব ঈমানদার ব্যক্তি সাড়া দেন কেবল তারাই প্লাবনের সময় নৌকারোহণের মাধ্যমে নাজাত পান।

নূহ্ (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২৮টি সূরায় ৮১টি আয়াত বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত বাপ-দাদার ধর্মের দোহাই নূহ্ (আলাইহিস সালাম) থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত সবাইকে দেওয়া হয়েছিল। আর সে কারণে প্রায় সকল নবীকেই স্ব স্ব জাতির নিকট থেকে চরম নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু সকল নবীর দাওয়াত ছিল এক ও অভিন্ন এবং তা ছিল নির্ভেজাল তাওহীদের প্রতি দাওয়াত। মহান আল্লাহর হুকুম যারা পালন করবে তারাই তো উত্তম প্রতিদানের হক্বদার, নিরাপদ। নবীগণ অনুসরণকারীদের বলেন, 'আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না; আমার প্রতিদান তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে'। নবীদের এ আকুতি আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামে হুবহু উল্লেখ করেছেন–

☝ "আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান (পারিশ্রমিক) চাই না; আমার প্রতিদান তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে।"[৭৩] মহান আল্লাহর শেখানো এ ঘোষণা সকল নবী উচ্চারণ করেছেন।

শেষনবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে তাঁর ক্বওমের নেতারা যখন নেতৃত্ব গ্রহণের অথবা ধন-দৌলতের বিনিময়ে তাওহীদের দাওয়াত পরিত্যাগের প্রস্তাব দিয়েছিল, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, 'যদি তোমরা আমার ডানহাতে সূর্য ও বামহাতে চন্দ্র এনে দাও, তথাপি আমি যে সত্য নিয়ে আগমন করেছি, তা পরিত্যাগ করব না'।

[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]

[৭২] সূরা হূদ : ৪৭।
[৭৩] সূরা আশ্ শু'আরা- : ১০৯; ইউনুস : ৭২; হূদ : ২৯।

শরীরে ট্যাটু অঙ্কন ও শরঈ বিধান

[২৩ পৃষ্ঠার পর]

ইসলামের দৃষ্টিতেও এগুলো হাদীসে নিষিদ্ধ প্রকৃত উল্কি বা ট্যাটু না হলেও অমুসলিমদের সাদৃশ্য অবলম্বনের কারণে তা ব্যবহার করা হারাম।

যাহোক, যদি কেবল তুলির রঙ ব্যবহার করে শরীরে ট্যাটু আঁকানো হয় আর তাতে চামড়ার উপর প্রলেপ না পড়ে তাহলে তাতে ওযূ-গোসল শুদ্ধ হবে। কেননা, মেহদি বা সাধারণ রঙ শরীরে থাকলেও চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে। কিন্তু যদি রঙ ব্যবহারের কারণে চামড়ার উপর আবরণ পড়ে ফলে চামড়ায় পানি পৌঁছতে বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে তা গরম পানি, সাবান, কেমিক্যাল ইত্যাদি ব্যবহার করে কাপড় বা অন্য কিছু দ্বারা ধীরে ধীরে ঘোষে তুলে ফেলা আবশ্যক। অন্যথায় ওযূ-গোসল ও সালাত শুদ্ধ হবে না।

আর শক্ত আঠা দিয়ে শরীরে স্টিকার লাগানো হলে তার ভেতর দিয়ে কখনোই চামড়ায় পানি পৌঁছবে না। সুতরাং এই অবস্থায় ওযূ গোসলও শুদ্ধ হবে না। তাই অনতিবিলম্বে স্টিকার ট্যাটু উঠিয়ে ফেলা আবশ্যক।

শাইখ আল্লামা আব্দুল আযীয বিন বায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "শরীরে উল্কি অংকন করা হারাম।" নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এ ব্যাপারে হাদীস সাব্যস্ত হয়েছে–

أنه : «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ».

"যে ব্যক্তি নিজে পরচুলা লাগায় এবং যে অন্যের কাছে লাগিয়ে নেয় এবং যে নিজে উল্কি আঁকে এবং উল্কি লাগিয়ে নেয় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অভিসম্পাত করেন।"[৭৪]

তবে কোনো মুসলিম যদি এটি হারাম হওয়া সম্পর্কে না জানার কারণে এমনটি করে অথবা বাল্যকালে শরীরে উল্কি আঁকায় তাহলে তা হারাম সম্পর্কে জানার পরে অবশ্যই তা শরীর থেকে দূর করতে হবে। কিন্তু এতে যদি কষ্ট বা ক্ষতি হয় তাহলে কেবল তাওবাহ্-ইস্তিগফার করাই যথেষ্ট। তারপর তা শরীরে থাকলেও ক্ষতি নেই।[৭৫]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অমুসলিমদের অন্ধ অনুকরণ, হারাম ও মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি মূলক কার্যক্রম থেকে হিফাযত করুন –আমিন। ❑

[৭৪] *সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : পোশাক, হা. ৫৯৩৩।*
[৭৫] *মজমূ' ফাতাওয়া- আল্লামা বিন বায, ১০/৪৪।*

বিদআতের সরলাংক

–আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন*

বিদআত ঐ সমস্ত ‘আমলকে বলা হয়, যা মানুষ দ্বীন মনে করে সাওয়াবের আশায় পালন করে; অথচ এটার সমর্থন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোনো হাদীসে নেই। এমনকি সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈনে এযাম ও স্বর্ণ যুগের কেউ তা পালন করেননি। ইমাম শত্বেবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় দ্বীনের নামে এমন কোনো প্রথা/‘আমল চালু করার নাম বিদআত, যা কোনো মৌলিক বা গৌণ শরঈ দলিলের উপর ভিত্তিশীল নয়।[৭৬] হাফেয ইবনু রজব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

فكل من أحدث شيئا و نسبه إلى الدين، و لم يكن له أصل من الدين يرجع إليه، فهو ضلالة.

“(বিদআত হলো) এমনসব নতুন বিষয় যা কেউ তৈরি করে দ্বীনের প্রতি সম্বন্ধ করে, অথচ তার শরিয়তে কোনো ভিত্তি নেই যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে। সেটি গুমরাহী।”[৭৭] অর্থাৎ- এমন ‘আক্বিদাহ্ ও ‘আমলের আবিষ্কার করা, যা কুরআন ও সহীহ হাদীসে নেই।

বিদআতের পরিণাম

বিদআত দু‘প্রকার। এক- ‘আক্বীদাহ্‌গত বিদআত। দুই ‘আমলে বিদআত। ‘আক্বীদাহ্‌গত বিদআত ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় : রাফেজী শিয়া, মু‘তাযিলা, আশ‘আরী ও মাদুরিদী ইত্যাদি মতবাদসমূহ। পরবর্তীতে এর সাথে যোগ দেয় ‘ইল্‌মে তাসাউ্যফ এর নামে সূফী-সন্যাসীদের সৃষ্টি নানাহ ভ্রান্তিমূলক ‘আক্বিদাহ্।

পক্ষান্তরে ‘আমলের মাঝে সৃষ্টি বিদআতসমূহও অতি মারাত্মক। এসব বিদআতের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো মীলাদ মাহফিল, কুরআনখানি, ইমাম মুসল্লি মিলে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত শেষে সম্মিলিত দু‘আ মুনাজাত করা, শবেবরাত পালন, সে রাতে হালুয়া রুটি খাওয়া দলে দলে কবর যিয়ারত করা, কুলখানি ও মৃত্যু দিবস পালন এবং বিভিন্ন প্রকার খতম পড়া ইত্যাদি। তবে মীলাদ মাহফিলে রাসূল (ﷺ) হাজির হন এ বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে ক্বিয়াম করা ‘আক্বীদাহ্‌গত বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। বিদআতের পরিণাম অতি ভয়াবহ। নিম্নে বিশেষ কয়েকটি পরিণাম স্ব-প্রমাণ উল্লেখ করা হলো–

১. ‘আমল প্রত্যাখ্যাত হবে : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ○ اَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ○ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾

অর্থ : “বলো, আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকদের সংবাদ দেব, যারা ‘আমলের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগস্ত। তার সেই লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়; অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। তারাতো সেই লোক, যারা তাদের রবের নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের ‘আমলসমূহ বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং ক্বিয়ামত দিবসে আমি তাদের কোনো ওজরই (গুরুত্ব দেব না) গ্রহণ করব না।”[৭৮]

এ প্রসঙ্গে রাসূল (ﷺ) বলেন :

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ، فَهُوَ رَدٌّ».

“যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু আবিষ্কার করল, যা তাতে নেই তা প্রত্যাখ্যাত।”[৭৯]

অপর বর্ণনায় এসেছে– রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান :

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

“যে ব্যক্তি এমন কোনো ‘আমল করল, যাতে আমাদের কোনো হুকুম নেই-তা প্রত্যাখ্যাত।”[৮০]

২. রাসূল (ﷺ)-এর উম্মতের তালিকা বহির্ভুত : রাসূল (ﷺ) বিদআতিকে তাঁর উম্মাত বহির্ভুত বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

---

* *সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত। সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস।*

[৭৬] *আল-ইতেসাম- ইমাম শাত্বেবী, ১/৩৭।*

[৭৭] *ইবনু রজব (জামেউল উলূমি ওয়াল হিকাম) তাহ্‌ক্বীক্ব-শু‘আয়েব আল আরনাউত্ব ও ইব্‌রাহীম বাজিস, মু‘আস্‌সাতুর রিসালাহ বাইরুত (৬ষ্ট সংস্করণ) ২/১২৮।*

[৭৮] *সূরা আল-কাহ্‌ফ : ১০৩-১০৫।*

[৭৯] *সহীহুল বুখারী- ফাতহ, ৫/২৬৯৭, মা. শা., হা. ২৬৯৭; সহীহ মুসলিম- হা. ১৭১৮।*

[৮০] *সহীহুল বুখারী- ৩/৬৯, ৯/১০৭ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১৮/১৭১৮।*

"যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হতে মুখ মুড়িয়ে নিলো, সে আমার উম্মাতভুক্ত নয়।"[৮১]

উপরোক্ত দৃঢ়তাব্যঞ্জক বাণীটি রাসূল (ﷺ) কখন করেছিলেন? কখন এতবড় ধমক দিলেন যে, তাঁর সুন্নাত থেকে মুখ ফিরালে আর তাঁর উম্মত বলে দাবী করা যাবে না? উল্লেখিত হাদীসখানা, যা আমরা দলিল হিসেবে পেশ করেছি তা সাহাবী আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের শেষাংশে। মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে রাসূল (ﷺ)-এর 'আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতঃ যে, তিন সাহাবী যথাক্রমে সারারাত জেগে জেগে সালাত আদায়, যুগভর সিয়াম পালন ও বিবাহ না করার সংকল্প করেছিলেন। তাঁদের এ সংকল্প রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাতের বাইরে হওয়ার কারণ তাঁদের প্রতি তিনি (ﷺ) এ কঠিন ধমক দিয়েছিলেন। ভেবে দেখুন! মীলাদ যার ভিত্তিই শরিয়তে নেই, তা করলে কী পরিণাম হবে?

৩. তাওবাহ্ ক্বুবুল না হওয়া : বিদআত না ছাড়া পর্যন্ত বিদআতীর তাওবাহ্ ক্বুবুল হবে না। এ মর্মে সাহাবী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। রাসূল (ﷺ) বলেন :

إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সকল বিদআতী হতে তাওবাহ্ বন্ধ করে দিয়েছেন।"[৮২]

৪. হাউজে কাউসার থেকে বঞ্চিত হওয়া : রাসূল (ﷺ)-কে আল্লাহ তা'আলা যে বিশেষ নিয়ামত দ্বারা বিশেষত্ব দান করেছেন, তন্মধ্যে হাউজে কাউসার অন্যতম। রোজ কিয়ামতে তাঁর উম্মতেরা সে হাউজ থেকে পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করবেন। কিন্তু বিদআতীরা এ নিয়ামত হতে বঞ্চিত হবে। এদের জন্য এর চেয়ে বড় আফসোস আর কী হতে পারে? সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান :

"أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَلَيُرْفَعَنَّ مَعِيْ رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُوْنِيْ، فَأَقُوْلُ : يَا رَبِّ أَصْحَابِيْ، إِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ".

"আমি হাউজে (উম্মতের জন্য আগেই) অপেক্ষমাণ থাকব। আর তোমাদের কিছু লোককে পেশ করা হবে। অতঃপর আমর নিকটে আসলে পর্দা দ্বারা আটকে দেয়া হবে। তখন আমি বলব : হে রব! আমার অনুসারী। আমাকে বলা হবে : তুমি (এদের সম্পর্কে) জানো না, তোমার পরে এরা কি বিদআত সৃষ্টি করেছ?"[৮৩]

৫. গোমরাহী ও জাহান্নাম অবধারিত : রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে যারা বিদআতের প্রচলন ঘটায়, তারা যে পথভ্রষ্ট তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ তা'আলা এদের পরিণাম সম্পর্কে বলেন :

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا﴾

"যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার নিকট সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর সে মু'মিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে থাকে। আমি তাকে সে পথেই ফিরিয়ে দেব– যে দিকে সে ফিরিছে এবং আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব, আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।"[৮৪]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً﴾

"অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত। অধিক 'আমলে পরিশ্রান্ত, ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে।"[৮৫]

কেন সেই পরিণতি এ জন্য তারা দুনিয়ায় ভ্রান্ত পথের 'আমল করত। 'আমল করে ক্লান্ত হয়ে পড়তে, কিন্তু এ 'আমলই তাদেরকে জাহান্নামে ফেলে দেবে। এ সম্পর্কে প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন :

«وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».

"আর নতুন আবিষ্কৃত নিকৃষ্ট। আর প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী।"[৮৬]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সকল প্রকার বিদআত হতে বিরত থাকার তাওফীক দিন –আমীন। ❑

---

[৮১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫০৬৩; সহীহ মুসলিম- হা. ১৪০১।*
[৮২] *সিলসিলাতুস্ সাহীহাহ্- আলবানী, হা. ১৬৬০।*
[৮৩]. *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৫৭৬; সহীহ মুসলিম- হা. ২২৯৭।*
[৮৪]. *সূরা আন্ নিসা : ১১৫।*
[৮৫] *সূরা আল গা-শিয়াহ্ : ১১৫।*
[৮৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ৮৬৭; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৬০৭।*

শরীরে ট্যাটু অঙ্কন ও শরঈ বিধান

–আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল*

বহু হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, শরীরে ট্যাটু (Tattoo) করা বা উল্কি অঙ্কন করা হারাম, কবিরা গুনাহ (বড় পাপ) এবং অভিশাপ যোগ্য কাজ। পাশাপাশি এটি অমুসলিমদের সাথেও সাদৃশ্য অবলম্বনে অন্তর্ভুক্ত। সেই সাথে এটি কৃত্রিমভাবে মহান আল্লাহর সৃষ্টিগত সৌন্দর্য বিকৃতির শামিল।

তাই নারী-পুরুষ সকলের জন্য শরীরে ট্যাটু উল্কি অঙ্কন করা, করিয়ে নেয়া, এটিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা, ইউটিউব বা অনলাইন-অফলাইনে এগুলো মানুষকে শিখানো বা প্রচার করা সম্পূর্ণ হারাম।

সেই সাথে ট্যাটুতে যদি অমুসলিমদের ধর্মীয় প্রতীক, প্রাণীর ছবি, ড্রাগনের মাথা, প্রাণীর কার্টুন, নারী-পুরুষের ছবি, বয় ফ্রেন্ড-গার্ল ফ্রেন্ড এর নাম, অশ্লীল বাক্য ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় অথবা বিপরীত লিঙ্গের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ট্যাটু করা হয় তখন তার গুনাহ ও ভয়াবহতা আরও বৃদ্ধি পায়।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে কিছু মুসলিম যুবক-যুবতী তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে কালিমা, আল্লাহ, রাসূল, কাবা শরীফ, মসজিদে নববী ইত্যাদি ইসলামী নিদর্শনের ট্যাটু অঙ্কন করে এটিকে হালাল করার অপচেষ্টা করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটিও অত্যন্ত গর্হিত কাজ ও ইসলামের প্রতি ধৃষ্টতার শামিল। সুতরাং এসব হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক। (আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করুন – আমিন)

কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, বর্তমানে অনেক মুসলিম যুবক-যুবতী এ বিষয়ে ইসলামের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে না জানার কারণে অথবা হয়ত জেনেও অবজ্ঞাবশতঃ তথাকথিত ফ্যাশন হিসেবে শরীরে উল্কি অঙ্কন বা ট্যাটু করছে, অনেকে রীতিমতো এ কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করছে। অথচ এ কাজ করা যেমন হারাম তেমনি এ পেশা থেকে উপার্জিত অর্থও হারাম।

* দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ সেন্টার, সৌদি আরব।

ট্যাটু প্রথার বিস্তৃতি এবং রাসূল (ﷺ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

দুঃখজনক হলেও সত্য, ইদানীং আমাদের মুসলিম সমাজে ট্যাটু প্রথা বৃদ্ধি পেয়েছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, ধনীদের আলালের ঘরের দুলাল তরুণ-তরুণীসহ বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণি-পেশার মানুষ এই অপসংস্কৃতিতে লিপ্ত হচ্ছে।

এই অপসংস্কৃতি বিস্তৃতির অন্যতম কারণ হলো, বিভিন্ন অমুসলিম বা নামধারী ফাসেক মুসলিম নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা, মডেল, খেলোয়াড় ইত্যাদির অন্ধ ভক্তি এবং অন্ধ অনুকরণ। কালের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়া কিছু বিপথগামী তরুণ-তরুণী পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয়ে তাদের মতো অন্যায়-অপকর্মে লিপ্ত হতে দ্বিধা করছে না।

সত্যি রাসূল (ﷺ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি সতর্ক করেছিলেন যে, ক্বিয়ামতের আগে এক শ্রেণীর মুসলিম ইয়াহূদি-খ্রিষ্টানদেরকে প্রতিটি পদে-পদে অনুসরণ-অনুকরণ করবে। এমনকি যদি তারা শান্ডার গর্তে প্রবেশ করে এরাও তাদের অনুসরণে ওই গর্তে গিয়ে প্রবেশ করবে।[৮৭] আল্লাহ এ সকল অর্বাচীন ও অজ্ঞ লোকদেরকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করুন এবং হিদায়েত করুন –আমীন।

ট্যাটু করা শরীরের জন্য কতটা ক্ষতিকর?

অনেক মানুষ জানে না যে, ট্যাটুতে যে রঙ ব্যবহার করা হয় তার সঙ্গে মেশানো হয় মারাত্মক একটি রাসায়নিক পদার্থ। এই রাসায়নিক পদার্থ শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে। আর যেহেতু এই উল্কি সারাজীবন শরীরে থাকবে তাই এই রাসায়নিক পদার্থ সারাজীবন দেহে থেকে যাবে। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের অসুখ এমনকি ক্যান্সারও হতে পারে। (বিশেষজ্ঞদের মতে, এতে হেপাটাইটিস, টিউবারকিউলোসিস, টিটেনাসের মতো বিভিন্ন রোগের সংক্রমণের আশঙ্কা আছে।)

গবেষক এফা মারিয়া বললেন, "আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী থেকে শুরু করে উল্কি আঁকার কালি নিয়ে গবেষণা করি। ২০১০ সালে আমরা বেশ কিছু ট্যাটু পার্লার থেকে কালি সংগ্রহ করেছি। প্রায় ৩৮ ধরনের কালি আমাদের সংগ্রহে আছে। এর মধ্যে লাল, হলুদ এবং কমলা রঙ ছিল সবচেয়ে বেশি।"

[৮৭] সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

পরীক্ষায় কী পাওয়া গেছে? যা পাওয়া গেছে তা ভয় পাওয়ার মতো। অনেক রঙ বা কালি তৈরি করা হয় এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে যা কোনো প্রাণীর ওপর ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ। এর মধ্যে একটি পদার্থের নাম এজো ডাই। রঙটি এমনিতে কোনো ক্ষতি করবে না কিন্তু অন্য কোনো কিছুর সংস্পর্শে আসলে তা হবে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এর মধ্যে আরও অনেক রাসায়নিক পদার্থ আছে যা ব্যবহারে কোনো নিষেধ নেই কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তা মানবদেহে ব্যবহার করা যাবে না। এফা মারিয়া আরও জানালেন, "এই পদার্থগুলো বাজারে পাওয়া যায় কারণ এগুলো প্লাস্টিক বা কঠিন পদার্থের ওপর প্রয়োগ করা যায়। গাড়ির রঙ বা দেয়ালের রঙে তা ব্যবহার করা যায়। আর সমস্যা এখানেই। এই পদার্থগুলো মানবদেহে ঢুকে কী কী ক্ষতি করতে পারে তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।"[৮৮]

শরীরে উল্কি ট্যাটু থাকা অবস্থায় ওযূ, গোসল এবং সালাত

প্রথমে আমাদের জানা দরকার যে, কীভাবে শরীরে উল্কি বা ট্যাটু আঁকা হয়। মূলতঃ শরীরে দু'ভাবে তা করা হয়। যথা-

১) স্থায়ী ট্যাটু : বিদ্যুৎচালিত একটি যন্ত্রের সাহায্যে তা করা হয়। দেখতে তা অনেকটা ডেন্টিস্ট-এর ড্রিল মেশিনের মতো যা দিয়ে দাঁতের চিকিৎসা করানো হয়। মেশিনের মাথায় রয়েছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি সুঁই। এই সুঁইটির মাথায় রঙ লাগানো থাকে। প্রতিবার সুঁইটি যখন চামড়ার ভেতরে প্রবেশ করানো হয় সেই সঙ্গে রঙও ভেতরে প্রবেশ করে। রঙের পরিমাণ এক মিলিলিটারেরও কম। চামড়ার যে স্তরে রঙটি লাগানো হয় তার নাম ডের্মিস। এই স্তরে যে কোনো রঙ ঢোকাতে পারলে তা সারাজীবন দেখা যাবে। ভিক্টর আরও বলল, "এটা বিশেষ এক পদ্ধতি। সারাজীবনই থাকবে। আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন এই উল্কি আপনার গায়ে থাকবে। বিষয়টি দারুণ উত্তেজনার।"

এ ক্ষেত্রে শরীরের যে স্থানে ট্যাটু করা হয় সেখানে রক্ত জমাট বাঁধে –যা নাপাক এবং রক্তের সাথে বিভিন্ন রঙ কেমিক্যাল, রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি মিশ্রণের ফলে সেখানে চামড়ার উপর একটা আস্তরণ তৈরি হয়। যার কারণে ওযূ-গোসলের সময় চামড়ায় পানি পৌঁছে না। তাই ট্যাটুকৃত স্থানটা নাপাক হওয়ার পাশাপাশি ওযূ-গোসলের সময় সেখানে পানি পৌঁছতে বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে এ অবস্থায় ওযূ-গোসল শুদ্ধ হবে না। ফলশ্রুতিতে সালাতও শুদ্ধ হবে না।

তবে কেউ যদি এর বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এমনটি করে থাকে তাহলে তা জানার সাথে সাথে অনুতপ্ত হৃদয়ে খাঁটি ভাবে তাকে মহান আল্লাহর নিকট তাওবাহ্-ইস্তিগফার করতে হবে এবং শরীরে লাগানো উল্কি/ট্যাটু উঠিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে।

বর্তমানে অস্ত্রোপাচারের মাধ্যমে অথবা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে লেজারের সাহায্যে স্থায়ী ট্যাটু রিমুভ করা সম্ভব। অবশ্য লেজারের মাধ্যমে ধীরে ধীরে এ কাজটি সম্পাদন করা হয় এবং এক সময় ট্যাটুর চিহ্ন মুছে যায়। ইদানীং এটি আমাদের দেশেও করা হচ্ছে।

কিন্তু কোনো কারণে যদি তা রিমুভ করা সম্ভব না হয় বা এতে অঙ্গহানি বা শারীরিক ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলে সে অবস্থাই যথারীতি ওযূ-গোসল এবং সালাত অব্যাহত রাখতে হবে। এ কারণে কোনোভাবেই সালাত পরিত্যাগ করা বৈধ নয়। খাঁটি অন্তরে তাওবার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায় ইন্‌শা-আল্লাহ।

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : ويصير الموضع الموشوم نجسا، لأن الدم المحبس فيه، فتجب إزالته إن أمكنت، ولو بالجرح، إلا إن خاف منه تلفا، أو شينا، أو فوات منفعة عضو : فيجوز إبقاؤه، وتكفي التوبة في سقوط الإثم، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. (انتهى من فتح الباري- ١٠ / ٣٧٢)

২) অস্থায়ী ট্যাটু : স্থায়ী ট্যাটুর বিকল্প হিসেবে অনেকে অস্থায়ী ট্যাটু ব্যবহার করে। এটি দু'ধরনের। যথা-

ক) এয়ারব্রাশ ট্যাটু : তুলির সাহায্যে রঙ দিয়ে শরীরে ট্যাটু আঁকা হয়। এটি দু'তিন মাসের মধ্যে শরীর থেকে আপনা আপনি মুছে যায়। এ কারণে এটিকে এয়ারব্রাশ ট্যাটু বলে।

খ) স্টিকার ট্যাটু : ট্যাটুর স্টিকার শরীরের পছন্দ মতো জায়গায় বসিয়ে ট্যাটু করা হয়। অবশ্য অস্থায়ী ট্যাটুকে পাশ্চাত্য সভ্যতায় ঠিক ট্যাটু বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না।

[১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন]

[৮৮] *উৎস : উড ডয়চে ভেলে-জার্মান তরঙ্গ-এর অফিসিয়াল বাংলা ওয়েব সাইট।*

বক্তৃতা ও বিবৃতি প্রদানে রাসূল (ﷺ)-এর আদর্শ

–মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন

[দ্বিতীয় পর্ব]

বক্তৃতার মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ও বাচালতা পরিহার করা

কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কথা বলা বা বাচালতা অনুচিত। এগুলো মানুষ পছন্দ করে না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ". قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُوْنَ قَالَ : الْمُتَكَبِّرُوْنَ.

‘তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র ও আচরণে সর্বোত্তম সে-ই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং কিয়ামত দিবসেও সে আমার খুবই নিকটে থাকবে। আর তোমাদের যে ব্যক্তি আমার নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্য সে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে আমার নিকট হতে অনেক দূরে থাকবে তারা হলো বাচাল, ধৃষ্ট-নির্লজ্জ এবং অহংকারে মত্ত ব্যক্তিরা। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! বাচাল ও ধৃষ্ট-দাম্ভিকদের তো আমরা জানি কিন্তু মুতাফাইহিকূন কারা? তিনি বললেন, অহংকারীরা’।[৮৯]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেন :

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِيْ يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَخَلُّلَ الْبَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا.

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা সেসব লোককে ঘৃণা করেন যারা বাকপটুত্ব প্রদর্শনের জন্য জিহবাকে দাঁতের সঙ্গে লাগিয়ে বিকট শব্দ করে, গরু তার জিহবা নেড়ে যেমন করে থাকে।’[৯০]

ভান করে বা ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে কথা বলাও ঠিক নয়। সহজ-সরলভাবে কথা বলা মু’মিনের জন্য জরুরি। সেই সাথে অহেতুক তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলা উচিত।

[৮৯] *জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ২০১৮।*
[৯০] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৫০০৫।*

বক্তৃতায় অশ্লিলতা পরিহার করা

অশ্লিল কথা বলা বা কথাবার্তায় অশ্লিল ভাষা প্রয়োগ করা মু’মিনের বৈশিষ্ট্য নয়। এগুলো সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। রাসূল (ﷺ) কখনো কোনো বক্তৃতায় অশ্লিল শব্দ প্রয়োগ করেননি। তিনি (ﷺ) বলেছেন,

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيْءِ.

মু’মিন কখনো দোষারোপকারী ও নিন্দাকারী হতে পারে না, অভিসম্পাতকারী হতে পারে না, অশ্লিল কাজ করে না এবং কটূভাষীও হয় না।[৯১]

বক্তৃতায় বাকবিতন্ডা পরিহার করা

তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া বা বাকবিতণ্ডা কখনো ভালো ফল বয়ে আনে না। কাজেই অপ্রয়োজনে এসব থেকে দূরে থাকা একান্ত জরুরি। রাসূল (ﷺ) বলেন,

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِيْ أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

‘আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পার্শ্বদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্কবিতর্ক বর্জন করে। সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি উপহাসছলেও মিথ্যা বলে না। আর সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের উর্ধ্বদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করে।’[৯২]

অন্যত্র তিনি বলেন, ‘হেদায়াত লাভের পর কোনো কওমই গোমরাহ হয়নি, যারা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়নি। অতঃপর তিনি পাঠ করেন বরং তারা হলো ঝগড়াকারী সম্প্রদায়।’[৯৩]

বক্তৃতায় কারো শোনা কথা যাচাই না করে বলা অনুচিত

রাসূল (ﷺ) যখন বক্তৃতা দিতেন তখন তিনি তথ্যবহুল কথা বলতেন কারো শোনা কথা যাচাই না করে বলতেন না। তাই কারো নিকট থেকে শোনা কথার সত্যাসত্য যাচাই না করে বলা উচিত নয়। কেননা এতে পাপী ও মিথ্যাবাদী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। নবী করীম (ﷺ) বলেন :

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

‘কোনো ব্যক্তির পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোনো কথা শোনামাত্রই (যাচাই না করে) বলে বেড়ায়।’[৯৪]

[৯১] *জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ১৯৭৭।*
[৯২] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৮০০।*
[৯৩] *সূরা আয্ যুখরুফ : ৫৮; আত্ তিরমিযী- ৩২৫৩; ইবনু মাজাহ্- ৪৮।*
[৯৪] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৯৯২।*

অন্যত্র তিনি বলেন, 'কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়।'[৯৫]

বক্তৃতায় অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বর্জন করা

বক্তৃতায় অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কথা পরিহার করতে হবে। কেননা এতে কোনো উপকারিতা নেই। রাসূল (ﷺ) বলেন,

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ.

'মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে তার অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করা।'[৯৬]

এছাড়া মানুষের ব্যক্ত করা কথাবার্তার কারণে তাকে শাস্তি পেতে হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا فَيَهْوِيْ بِهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

'মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে এবং তাকে দূষণীয় মনে করে না। অথচ এই কথার দরুন সত্তর বছর ধরে সে জাহান্নামে পতিত হতে থাকবে।'[৯৭] রাসূল (ﷺ) অসংখ্য বক্তৃতা দিয়েছেন কিন্তু কোনো বক্তৃতায় একটিও অনর্থক অপ্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহার করেননি।

রাসূল (ﷺ) কোনো কিছুর উপর ভর দিয়ে বক্তৃতা দিতেন

রাসূলে করীম (ﷺ) যখন জিহাদের ময়দানে মুজাহিদদের সম্মুখে ভাষণ দিতেন, তখন ধনুকের উপর ভর করতেন। কখনও আবার কোনো কিছুতে ঠেস রাখতেন।[৯৮]

হিজরতের পর যখন তিনি মসজিদুন নববীতে বসে বিভিন্ন সময়ে মুসলিমদের সম্মুখে বক্তব্য রাখা শুরু করেন, তখন তিনি একটি খর্জুরকাণ্ডে ভর করতেন। মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সাহাবা-ই কিরাম তার জন্য একটি মিম্বর নির্মাণ করে দেন, যাতে সকলে তাকে দেখতে পায়।[৯৯]

কখনও তিনি লাঠির উপর ভর দিয়েও বক্তৃতা দিতেন। আল-জাহিজ বর্ণনা করেন যে, এ লাঠিখানি খুলাফা-ই-রাশিদীনের নিকট হস্তান্তর হতে থাকে এবং তারা এই সুন্নত-ই-নববীর অনুসরণ করতে থাকেন। সর্বশেষ উমাইয়া খলীফা স্বীয় পরিণতি দেখে গোলামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাদর এবং লাঠি যেন কোথাও দাফন করে দেয় কিন্তু সে তা ক্ষমতাসীন 'আব্বাসীয় খলীফার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়।

রাসূল (ﷺ) মানহানিমুলক কোনো বক্তৃতা দিতেন না

ইফতিরা হলো কোনো ব্যক্তির উপর মিথ্যা দোষারোপ করা, ক্ষতি সাধনের, কারো বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ করা অথবা কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কল্পিত মিথ্যা কথা বলা। কুরআনের ব্যবহার রীতি অনুযায়ী ইফতিরা হলো মিথ্যা কথা বলার সমার্থক। যেমন- আল্লাহ বলেন–

﴿وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ﴾

"ইসলামের দিকে আহ্বান করা সত্ত্বেও, যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[১০০] মানহানিকর বক্তব্য, মিথ্যা কথা ও মিথ্যা অভিযোগ হচ্ছে বাকস্বাধীনতার লঙ্ঘন যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সুতরাং মানহানিকর সকল কথা ও কর্ম হতে বিরত থাকা সকলের কর্তব্য।

বক্তৃতায় কাউকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করা

বক্তব্যের সময় কাউকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, বিকৃত নামে ডাকা ইসলাম খুব কঠিনভাবে নিষেধ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾

"হে মু'মিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর কোনো নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যারা তাওবাহ্ না করে, তারাই জালিম।"[১০১]

রাসূল (ﷺ) অভিসম্পাত দিয়ে কোনো বক্তৃতা দিতেন না

অভিশাপ বা অভিসম্পাত (লান বা লানাহ) হচ্ছে সাধারণত অসন্তোষের প্রকাশ এবং অভিশাপ হচ্ছে প্রচন্ড ক্রোধজনিত

[৯৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ৫; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৫৬।*
[৯৬] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৯৭৬।*
[৯৭] *আত্ তিরমিযী- হা. ২৩১৪; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৯৭০।*
[৯৮] *সীরাতুন নবী- ২/২৩৪।*
[৯৯] *আত-তাবাকাত- ইবনু সা'দ, পৃ. ৯-১২।*
[১০০] *সূরা আস্ সাফ্ : ৭।*
[১০১] *সূরা আল হুজুরা-ত : ১১।*

অমঙ্গল কামনা। প্রায়ই অভিশাপের কথা উচ্চারণ ও কোনো ব্যক্তির উপর মহান আল্লাহর রোষানলে পতিত হোক, এমন কথা বলে অভিসম্পাত করা হয়ে থাকে, যেমন, তার ওপর মহান আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক। সে অভিশাপের রোষানলে জ্বলে-পুড়ে মরুক। রাসূল কখনো অভিসম্পাত দিয়ে কোনো বক্তৃতা দিতেন না। ইসলামের ইতিহাসে অভিসম্পাতের একটি ঘটনা জানা যায়। মক্কার কাফিররা খুবাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে আটক করে এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়। শাহাদাত লাভের ঠিক আগে তিনি যে কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন তা হলো– "হে আল্লাহ! তুমি এদের সংখ্যা গণনা করে রাখো, তাদেরকে বিক্ষিপ্তিভাবে হত্যা করো এবং এদের একজনকেও বাকী (জীবিত) রেখ না।"

রাসূল (ﷺ) ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বক্তৃতা দিতেন

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কখনও তাড়াহুড়া ও এলোমেলোভাবে খুতবা দিতেন না, ধারাবাহিকতা বজায় রেখে স্বল্প বিরতি সহকারে বক্তব্য পেশ করতেন, যাতে শ্রোতাদের হৃদয়ঙ্গম করতে সুবিধা হয়। ইতিহাসবিদ ইবন সা'দ-এর মতে, তিনি কণ্ঠস্বরকে প্রলম্বিত করতেন। বিস্‌মিল্লা-হির রহ্‌মা-নির রাহীম আবৃত্তি করার সময় তিনি বিস্‌মিল্লা-হ-কে দীর্ঘায়িত, আর রহ্‌মানকে দীর্ঘায়িত ও আর রাহীমকে দীর্ঘায়িত করতেন। খুতবাহ্ দেয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চক্ষুদয় কখনও রক্তিম বর্ণ ধারণ করত এবং কণ্ঠস্বর উচ্চ হত ক্রমান্বয়ে, ঠিক যেন সকাল বা সন্ধ্যায় আক্রমণে উদ্যত এমন শত্রুসৈন্যদের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিতেছেন শ্রোতাদেরকে[১০২]।

উপমা দিয়ে বক্তৃতা দেওয়া

নবী করিম (ﷺ) অনেক সময় কোনো বিষয় স্পষ্ট করার জন্য উপমা ও উদাহরণ পেশ করতেন। সাহাল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এমনভাবে অবস্থান করব। সাহাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ) তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙুলের প্রতি ইঙ্গিত করেন।'[১০৩]

কখনো কখনো কোনো বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য রাসূল (ﷺ) রেখাচিত্র ও অঙ্কনের সাহায্য নিতেন। আবূ মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূল (ﷺ) একটি চারকোনা দাগ দিলেন। তার মাঝ বরাবর দাগ দিলেন, যা তা থেকে বের হয়ে গেছে। বের হয়ে যাওয়া দাগটির পাশে এবং চতুষ্কোণের ভেতরে ছোট ছোট কিছু দাগ দিলেন। তিনি বললেন, এটি মানুষ। চতুষ্কোণের ভেতরের অংশ তার জীবন এবং দাগের যে অংশ বের হয়ে গেছে সেটি তার আশা।'[১০৪]

নিজে 'আমল না করে সে বিষয়ে বক্তব্য দেওয়া নিন্দনীয় কাজ

এমন কোনো বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করা উচিত নয়, যার সাথে তার কাজের বা ব্যক্তিগত 'আমলের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কেননা মহান আল্লাহর কাছে এ ধরনের বক্তব্য নিন্দিত ও ঘৃণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴾

"তোমরা কি মানুষকে সৎকার্যের নির্দেশ দাও, আর নিজেরাই তা ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করো; তবে কি তোমরা বুঝো না?"[১০৫]

বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যায় ক্বাতাদাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, বনী ইসরাঈলরা মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্য, তাক্বওয়া ও কল্যাণের কাজের আদেশ করতো; অথচ নিজেরা এর উল্টো চলতো। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এমন কাজকে ভর্ৎসনা করেছেন। ইমাম ইবনু জারীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান ও মুনাফিক্বরা মানুষকে নামায ও রোযার আদেশ করতো; অথচ যেসব কল্যাণকর কাজের আদেশ করতো, তা নিজেরা পরিত্যাগ করে চলতো। তাদের এমন 'আমলহীন দাওয়াতের প্রতি তিরস্কার করে আল্লাহ তা'আলা এ মন্তব্য করেন। আসলে যে ভালো কাজের আদেশ দেবে, সে ওই কাজে দ্রুত ধাবিত হবে–

﴿يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যা করো না– তা তোমরা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।"[১০৬]

মুসনাদ আহমাদের এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ইসরার (মি'রাজ) রাতে আমি এমন একশ্রেণির মানুষের নিকট দিয়ে গমন করলাম, যাদের জিহ্বাকে জাহান্নামের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। আমি জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ওরা কারা? তিনি বললেন, এরা হলো তোমার উম্মতের দুনিয়াদার বক্তা। তারা যেসব ভালো কাজের আদেশ করতো, তা নিজেরা ভুলে বসত, অথচ তারা কিতাব পাঠ করছে।

---

[১০২] *আত্ তাবাকাত আল-কুবরা- ১/৪৪০-২।*
[১০৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০০৫।*
[১০৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪১৭।*
[১০৫] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৪৪।*
[১০৬] *সূরা আস্ সাফ্ : ২-৩।*

যাচাই-বাছাই করে বক্তব্য প্রদান করা

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ دَخَالُوْنَ كَذَّبُوْنَ يَأْتُوْنَكُمْ من الأحاديث بمَا لَمْ تَسْمَعُوْا أَنْتُمْ وَلَا آبَائُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَمِنَ إِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يُفْتِنُوْنَكُمْ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, শেষ যামানায় কিছু সংখ্যক মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তারা তোমাদের নিকট এমন সব অলীক কথা-বার্তা উপস্থিত করবে, যা না তোমরা শুনেছ না তোমাদের বাপ-দাদা শুনেছে। সাবধান! তোমরা তাদের থেকে বেঁচে থাকো এবং তাদেরকে তোমাদের থেকে বাঁচাও। অর্থাৎ- সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক। যাতে তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং তোমাদের বিপথগামী করতে না পারে।[১০৭]

অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা মিথ্যা বানোয়াট হাদীস এবং মিথ্যা কল্প-কাহিনি বর্ণনা করে মানুষকে আকৃষ্ট করে, তাদের বক্তৃতা শ্রবণ থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় তারা লোকদেরকে বিভ্রান্ত করবে।

عن محمد بن سيرينَ قَالَ هَذَا إِنَّ الْعِلْمَ دينَ فَانظُرُوْا مَنْ تَاخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ.

মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নিশ্চয়ই এ 'ইল্‌ম দ্বীন, সুতরাং তোমরা ঐ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করো, যার নিকট তোমরা দ্বীন গ্রহণ করছ।[১০৮]

عَنِ ابْنِ سرينَ قَالَ لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْتَلُوْنَ عَنِ الْإِسناد فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا سَمُّوْا لَنا رِجَالُكُمْ فَيُنظر إِلى أَهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظرَ إِلَى أَهْلِ الْبَدْعِ فَلَا يُؤْعَدُ.

মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এক সময়ে মানুষ হাদীসের সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। যখন ফিৎনা শুরু হলো অর্থাৎ- যাছাই-বাছাই না করে মানুষ সত্য-মিথ্যা বলা শুরু করল তখন শ্রোতারা বলল, আপনারা সূত্র সহকারে বলুন। যদি বর্ণনাকারীগণ সুন্নাতের অনুসারী হতেন, তাহলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হতো। আর যদি বিদআতী হতেন, তাহলে তাদের হাদীস বর্জন করা হতো।[১০৯]

আলোচ্য হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, যারা সুন্নাতের পাবন্দী এবং পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে বক্তব্য পেশ করেন তাদের বক্তব্য শ্রবণ করতে হবে।

[১০৭] *সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৪৫।*
[১০৮] *সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২৯৩।*
[১০৯] *সহীহ মুসলিম- ১/১১ পৃ.।*

গণমাধ্যমে মিথ্যা বক্তব্য ও বিবৃতি

গণমাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ ও সৎ সাংবাদিকতা দেশ ও জাতির তথা বিশ্ব মানব কল্যাণে যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। আবার মিথ্যা, অবাস্তব ও বানোয়াট সংবাদ প্রচারের কারণে অশান্তি ও অস্থীতিশীলতাও তৈরি হয়। এখানে যে মিথ্যা প্রচার করা হয় তা সারা দেশে, সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়ে যায় এবং এর কারণে নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ফলে এমন ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রচারের শাস্তি অনেক ভয়াবহ।

মি'রাজের রাতে রাসূল (ﷺ)-কে বিভিন্ন অপরাধীদের শাস্তি দেখানো হলো। তার মধ্যে ছিল– এক লোক বসা, পাশে আরেকজন দাঁড়ানো। তার হাতে লোহার পেরেক। লোহার পেরেক দিয়ে এই লোক পাশের লোকটির চোয়ালে আঘাত করে এবং পেরেকটি তার চোয়ালে ঢুকিয়ে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যায়। তারপর একইভাবে অপর চোয়ালে আঘাত করে। ততক্ষণে আগের চোয়াল স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং সে আবার আঘাত করতে থাকে। জিজ্ঞাসা করা হলো, এরা কারা? বলা হলো, সামনে চলো। (এভাবে অন্যান্য অপরাধীদের শাস্তিও দেখানো হলো। পরিশেষে যখন একে একে বিস্তারিত কারণ জানানো হলো, তখন বলা হলো–

أَمَّا الَّذِيْ رَأَيْتَهُ يُشَقَّ شِدْقُهُ، فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالكَذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

আঘাত করে করে যার চোয়াল বিদীর্ণ করে ফেলতে দেখেছেন, সে ছিল মিথ্যাবাদী। মিথ্যা বলত (এবং তা প্রচার করত) ফলে তার বলা মিথ্যা প্রচার হতে হতে দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ত। কাজেই কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এমনটি করা হতে থাকবে, এভাবেই তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।[১১০]

শ্রোতাদের করণীয়

শ্রোতাদের জন্য জরুরি হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস শোনা এবং তদনুযায়ী 'আমল করা। শুনে না মানা বা না মানার উদ্দেশ্যে হলো মুনাফিক্বের 'আমল। কাজেই মেনে চলার উদ্দেশ্যে শ্রবণ করতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, "মু'মিন তারাই যারা বলে আমরা শ্রবণ করেছি ও মান্য করেছি"[১১১]। রাসূল (ﷺ) যে কথাগুলো বলতেন সে কথাগুলো মেনে চলার জন্য সাহাবীদের নিকট থেকে ওয়াদা বা অঙ্গীকার নিতেন[১১২]।

[২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন]

[১১০] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৩৮৬।*
[১১১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৮৫।*
[১১২] *সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৮।*

ক্বাসাসুল কুরআন

বাগান মালিক ও তার সন্তানদের ঘটনা

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র আল কুরআনুল কারীমে বাগান মালিক ও তার সন্তানদের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন,

﴿إِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ إِذْ أَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ○ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ○ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ○ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ○ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ○ أَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ○ فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ○ أَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ○ وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ○ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوْا إِنَّا لَضَآلُّوْنَ ○ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ○ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُوْنَ ○ قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ○ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ﴾

"আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান-অধিপতিদের– যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা প্রত্যুষে আহরণ করবে বাগানের ফল এবং তারা 'ইন্‌শা-আল্লাহ' বলেনি। অতঃপর তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে এক বিপর্যয় হানা দিলো সে উদ্যানে, যখন তারা ছিল নিদ্রিত। ফলে তা দগ্ধ হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। প্রত্যুষে তারা একে অপরকে ডেকে বলল– 'তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল বাগানে চলো।' অতঃপর তারা চলল নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে। 'আজ যেন তোমাদের নিকটে কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে।' অতঃপর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম– এই বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করল। অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল– 'আমরা তো দিশা হারিয়ে ফেলেছি। বরং আমরা তো বঞ্চিত।' তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল– 'আমি কি তোমাদের বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না কেন?' তখন তারা বলল– 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম।' অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল। তারা বলল– 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালঙ্ঘনকারী।"[১১৩]

বাগানওয়ালাদের ঘটনা আরবদের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিল। এই বাগানটি (ইয়ামানের) সানআ' থেকে দুই ফারসাখ (৬ মাইল) দূরত্বে অবস্থিত ছিল। হযরত সাঈদ ইবনু জুবায়ের (রহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, এ লোকগুলো ছিল যারওয়ানের অধিবাসী যা (তৎকালীন ইয়ামানের রাজধানী) সানাআ হতে ছয় মাইল দূরবর্তী একটি গ্রাম। অন্যান্য মুফাসসির বলেন যে, এরা ছিল হাবশের অধিবাসী। মাযহাবের দিক দিয়ে তারা আহলে কিতাব ছিল।

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, ওটা আঙ্গুরের বাগান ছিল। তারা চুপে চুপে কথা বলতে বলতে চললো যাতে কেউ শুনতে না পায় এবং গরিব মিসকীনরা টের না পায়। যেহেতু তাদের গোপনীয় কথা ঐ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিকট গোপন থাকতে পারে না সেই হেতু তিনি বলেন, তাদের এ গোপনীয় কথা ছিল, 'তোমরা সতর্ক থাকবে, যেন কোন গরিব মিসকীন টের পেয়ে আজ আমাদের বাগানে আসতে না পারে। কোনোক্রমেই কোনো মিসকীনকে আমাদের বাগানে প্রবেশ করতে দিবে না।' এভাবে দৃঢ় সংকল্পের সাথে গরিব দরিদ্রদের প্রতি ক্রোধের ভাব নিয়ে তারা তাদের বাগানের পথে যাত্রা শুরু করলো।

সুদ্দী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, স্বয়ং তাদের গ্রামের নামই ছিল হারদ। কিন্তু এটা সঠিক কথা নয়। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বাগানের ফল তাদের দখলে রয়েছে। সুতরাং তারা ফল আহরণ করে সবই বাড়িতে নিয়ে আসবে। কিন্তু বাগানে পৌঁছে তারা হতভম্ব হয়ে পড়ে দেখে যে, সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেত এবং পাকা পাকা ফলের গাছ সব ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে। ফলসহ সমস্ত গাছ পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। এখন এগুলোর আধা পয়সারও মূল্য নেই। গাছগুলোর জ্বলে যাওয়া কালো কালো কাণ্ড ভয়াবহ আকার ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। **প্রথমতঃ** তারা মনে করলো যে, ভুল করে তারা অন্য কোনো বাগানে এসে পড়েছে। আবার ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তারা বললো ও আমাদের কাজের পন্থাই ভুল ছিল, যার পরিণাম এই দাঁড়ালো। যা হোক পরক্ষণেই তাদের ভুল ভেঙে গেল।

তারা বললো : 'আমাদের বাগান তো এটাই, কিন্তু আমরা হতভাগ্য বলে আমরা বাগানের ফল লাভে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সৎ ও ন্যায়পন্থি ছিল সে তাদেরকে বললো : দেখো, আমি তো তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছিলাম। তোমরা ইন্‌শা-আল্লাহ বলছো না কেন?'

সুদ্দী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, তাদের যুগে সুবহানাল্লাহ্ বলাও ইন্‌শা-আল্লাহ বলার স্থলবর্তী ছিল।

ইমাম ইবনু জারীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, এর অর্থই হলো ইন্‌শা-আল্লাহ বলা। এটাও বলা হয়েছে যে, তাদের উত্তম ব্যক্তি

* *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

[১১৩] *সূরা আল ক্বলম : ১৭-৩১।*

তাদেরকে বলে? "দেখো, আমি তো তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, তোমরা কেন আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা এবং প্রশংসা করছো না? এ কথা শুনে তারা বললো : আমাদের প্রতিপালক পবিত্র ও মহান। নিশ্চয়ই আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি। যখন শাস্তি পৌঁছে গেল তখন তারা আনুগত্য স্বীকার করলো, যখন 'আযাব এসে পড়লো তখন তারা নিজেদের অপরাধ মেনে নিলো। অতঃপর তারা একে অপরকে তিরস্কার করতে লাগলো এবং বলতে থাকলো। আমরা বড়ই মন্দ কাজ করেছি যে, মিসকীনদের হক্ব নষ্ট করতে চেয়েছি এবং আল্লাহ পাকের আনুগত্য করা হতে বিরত থেকেছি। তারপর তারা সবাই বললো : এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের হঠকারিতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এ কারণেই আমাদের উপর মহান আল্লাহর 'আযাব এসে পড়েছে। অতঃপর তারা বললো : 'সম্ভবতঃ আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন। অর্থাৎ- দুনিয়াতেই তিনি আমাদেরকে এর চেয়ে ভালো বদলা দিবেন। অথবা এও হতে পারে যে, আখিরাতের ধারণায় তারা এ কথা বলেছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

ঐ বাগানটি তারা তাদের পিতার নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল। তাদের পিতার নীতি এই ছিল যে, বাগানে উৎপাদিত ফল ও শস্যের মধ্য হতে বাগানের খরচ বের করে এবং নিজের ও পরিবার পরিজনের সারা বছরের খরচ বের করে নিয়ে বাকীগুলো মহান আল্লাহর নামে ব্যয় করে দিতেন। পিতার ইন্তেকালের পর তাঁর এই সন্তানরা পরস্পর পরামর্শ করে বললো : "আমাদের পিতা বড়ই নির্বোধ ছিলেন। তা না হলে তিনি এতোগুলো ফল ও শস্য প্রতি বছর এদিক-ওদিক দিয়ে দিতেন না। আমরা যদি এগুলো ফকির মিসকীনদেরকে প্রদান না করি এবং তা যথারীতি সংরক্ষণ করি তবে অতি সত্বর আমরা ধনী হয়ে যাবো।" তারা তাদের এ সংকল্প দৃঢ় করে নিলো। ফলে তাদের উপর ঐ শাস্তি এসে পড়লো যা তাদের মূল সম্পদকেও ধ্বংস করে দিলো। তারা হয়ে গেল সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে। অর্থাৎ- যে কেউই মহান আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তাঁর নিয়ামতের মধ্যে কার্পণ্য করতঃ দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের হক্ব আদায় করে না; বরং তাঁর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তার উপর এরূপই শাস্তি আপতিত হয়ে থাকে। এটা তো হলো পার্থিব শাস্তি, আখিরাতের শাস্তি তো এখনো বাকী রয়েছে যা কঠিনতর ও নিকৃষ্টতর। ইমাম বায়হাকী (রাহিমাহুল্লাহ) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাত্রিকালে ফসল কাটতে এবং বাগানের ফল আহরণ করতে নিষেধ করেছেন।[১১৪] ❑

[১১৪] *তাফসীরে ইবনু কাসীর।*

বক্তৃতা ও বিবৃতি প্রদানে রাসূল...

[২৭ পৃষ্ঠার পর]

কোনো কোনো সাহাবী রাসূল (ﷺ)-এর মুখ থেকে কিছু শুনে বলতেন আল্লাহর কসম যা শুনলাম তার কম-বেশি করব না।[১১৫] সাহাবীগণ শরিয়ত শুনার জন্য রাসূল (ﷺ)-এর কাছে আসতেন এবং সে অনুপাতে 'আমল করে জান্নাত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন।[১১৬] সাহাবীগণ জান্নাতে প্রবেশের এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের 'আমল শুনতে চাইতেন।[১১৭] আলোচ্য হাদীসসমূহ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, জাহান্নাম থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে এবং জান্নাত লাভের আশায় আলেমদের নিকট কুরআন-হাদীস শুনতে হবে এবং সে অনুযায়ী 'আমল করতে হবে। এখানে যেহেতু 'আমল করার উদ্দেশ্যে শুনতে হবে, কাজেই সত্য-মিথ্যা যাচাই করে শুনা একান্ত জরুরি।

ইসলামের ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বক্তা হিসেবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার উপস্থাপনা আকর্ষণীয় ও জোরালো। তার বাক্যগুচ্ছ গভীর অনুভূতিপ্রবণ ও আবেগময়। শব্দচয়ন ও বাক্যনির্মাণে তার অনুপম কমনীয়তার ছোঁয়াচে স্পষ্ট এবং প্রকাশভঙ্গি ও ধরণ উল্লেখযোগ্য। তার চিন্তা ও ভাষা দু-ই লৌকিকতা বর্জিত। অনুভূতির সততা ও প্রকাশের সারল্য তার ভাষণ প্রাণবন্ত ও তেজোময়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতিটি বক্তব্য ছিল যৌক্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত ও সমাধানমূলক। তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষণ দক্ষতা শ্রোতাদের চেতনাকে শানিত করত। ভাষণ দক্ষতা মহান আল্লাহর অন্যতম দান, যার মাধ্যমে মানুষ সমৃদ্ধতর হয়েছে। এই দক্ষতার উন্মেষের মাধ্যমে শুধু আধুনিক যুগে নয়; বরং প্রাচীন কালেও গ্রীস ও রোমসহ অন্যান্য দেশে বাগ্মীগণ জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং তাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব লাভে সমর্থ হয়েছেন। আবহমান কাল ধরে আরব জনগণের সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য ও জীবনধারায় তাদের মাতৃভাষার প্রভাব-প্রতিপত্তি অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর তুলনায় অত্যধিক। তাদের জীবন ও ভাষা যেন একই সূত্রে গ্রথিত। ঐতিহাসিক পি.কে. হিট্টির মতে, "The Arabians created or developed no great art of their own. Their artistic nature found expression through one medium only speech. By virtue of its peculiar structure Arabic lent itself admirably to a terse, trenchant, epigrammatic manner of speech". *[সমাপ্ত]*

[১১৫] *সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৪।*
[১১৬] *সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৭।*
[১১৭] *জামে' আত্ তিরমিযী, মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২৯, সহীহ।*

বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

পিতা-মাতার কবরে সূরা ইয়া-সীন তিলাওয়াত করা

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশ্‌র : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : আমাদের সমাজে হাদীসের নামে জাল-য‘ঈফ বর্ণনার অবস্থা এক প্রকার মহামারি আকার ধারণ করেছে। এমনই একটি বর্ণনা হলো– “যে ব্যাক্তি প্রত্যেক জুমু‘আর দিবসে তার পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করবে। অতঃপর তাদের উভয়ের নিকট অথবা পিতার কবরের নিকট সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে, প্রত্যেক আয়াত অথবা অক্ষরের সংখ্যার বিনিময়ে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।”

হাদীসটি ইবনু আদী (১/২৮৬), আবূ নু’য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/৩৪৪-৩৪৫) ও আব্দুল গনী আল-মাকদেসী “সুনান” গ্রন্থে (২/৯১) ... আমর ইবনু যিয়াদ সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন।

কোনো মুহাদ্দিস (আমার ধারণা তিনি হচ্ছেন ইবনু মুহিব কিংবা যাহাবী) “সুনানুল মাকদেসী” গ্রন্থের হাশিয়াতে (টীকাতে) লিখেছেন, هذا حديث غير ثابت এ হাদীসটি সাব্যস্ত হয়নি।

ইবনু আদী বলেন, হাদীসটি বাতিল। এ সনদে এটির কোনো ভিত্তি নেই। আমর ইবনু যিয়াদ (তিনি হচ্ছেন আবুল হাসান আস-সাওবানী)-এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তার অন্যান্য হাদীসের সাথে এ হাদীসটির ব্যাপারে উল্লেখিত মন্তব্যটি করেন। সে সব হাদীসের একটি সম্পর্কে বলেন, موضوع জাল (বানোয়াট)।

অতঃপর বলেন, আমর ইবনু যিয়াদ-এর এ হাদীসটি ছাড়া আরো হাদীস রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কিছু আছে নির্ভরযোগ্যদের থেকে চুরি করা এবং কিছু আছে বানোয়াট। তাকে সেগুলো জালকারী হিসেবে দোষী করা হয়েছে। দারাকুতনী বলেন, يضع الحديث। তিনি হাদীস জাল করতেন।

এ কারণে ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে তার “আল-মাওযু আত” গ্রন্থে (৩/ ২৩৯) ইবনু আদীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন। তিনি ঠিকই করেছেন। অথচ সুয়ূতী তার সমালোচনা করে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/৪৪০) বলেছেন, হাদীসটির সমর্থনে শাহেদ আছে। অতঃপর তিনি এ হাদীসটিতে পূর্বের হাদীসের সনদটিই উল্লেখ করেছেন। যেটি সম্পর্কে আপনি জেনেছেন যে, সেটিও জাল হাদীস। যদিও বলা হয়েছে সেটি শুধু দুর্বল। তা সত্ত্বেও সেটিকে এ হাদীসের শাহেদ হিসাবে ধরা যেতে পারে না। কারণ এটির সাথে সেটির ভাষার মিল নেই। আর জাল হাদীসের শাহেদ হিসাবে জাল হাদীস উল্লেখ করাতে কোনো উপকারিতাও নেই।

উল্লেখ্য কবরের নিকট কুরআন পাঠ করা মুস্তাহাব এ মর্মে সহীহ সুন্নাহ হতে কোনো প্রমাণ মিলে না। বরং সহীহ সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, কবর যিয়ারতের সময় মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র সালাম প্রদান করা এবং আখিরাতকে স্মরণ করাই হচ্ছে শরিয়ত সম্মত। সালাফে সালেহীনের ‘আমল এর উপরেই হয়ে আসছে। অতএব কবরের নিকট কুরআন পাঠ করা ঘৃণিত বিদআত। যেমনটি স্পষ্টভাবে পূর্ববর্তী একদল ওলামা বলেছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য ইমামগণ, কারণ এ মর্মে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি।

এ জাতীয় ভ্রান্ত কথারও প্রচলন আছে যে, কোনো মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে গিয়ে যদি কেও ৪০ দিন সূরা ইয়া-সীন পাঠ করে তাহলে মৃত ব্যক্তির কবরের ‘আযাব মাফ হবে। কিন্তু বাস্তবসম্মত কথা হলো– কোনো ব্যক্তি যদি বেঁচে থাকা অবস্থায় কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণে ‘আমল না করে তাহলে তার কবরের পাশে কেবল সূরা ইয়া-সীন নয় যদি পূরো কুরআন কেবল ৪০ দিন নয়; বরং সারা বছর তিলাওয়াত করা হয় তারপরও তার কোনো কাজে লাগবে না। মৃত প্রায় বা মারা গেছে এমন ব্যক্তির পাশে সূরা ইয়া-সীন পড়ার হাদীসটি সহীহ নয়; বরং য‘ঈফ। গোরস্থান কুরআন তিলাওয়াতের স্থান নয়। কুরআন মৃত মানুষের কোনো উপকার করবে না। কেননা কুরআন এসেছে– জীবিত মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের দিকনির্দেশনার জন্য; মৃত মানুষের জন্য নয়।

এতদ্ব্যতীত সূরা ইয়া-সীনকে ঘিরে আমাদের সমাজে বেশ কিছু জাল-য'ঈফ বর্ণনার অবতারণা হয়েছে। সে বর্ণনাসমূহের কিছু অংশ যথাক্রমে উপস্থাপিত হলো।

১. একটি বানোয়াট কথিত হাদীসের মধ্যে এসেছে– "যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করে সেখানে সূরা ইয়া-সীন পাঠ করবে সেদিন তাঁদের (কবরবাসীর) 'আযাব হালকা করা হবে এবং সেখানে যারা রয়েছে তাদের সংখ্যায় সে ব্যক্তির (পাঠকারীর) জন্য সাওয়াব লিখা হবে।" [কিন্তু এটি বানোয়াট, রাসূল (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিকে জাল করা হয়েছে।][১১৮]

২. অন্য এক বানোয়াট হাদীসের মধ্যে এসেছে– "কোনো ব্যক্তি মারা গেলে আর তাঁর নিকটে সূরা ইয়া-সীন পাঠ করা হলে আল্লাহ তা'আলা সহজ করে দেন।" [কিন্তু হাদীসটি বানোয়াট, রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে।][১১৯]

৩. "যে ব্যক্তি জুমু'আর রাতে সূরা ইয়া-সীন পাঠ করবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[১২০]

৪. "যে ব্যক্তি সূরা ইয়া-সীন পাঠ করবে তাঁর দ্বারা মহান আল্লাহকে পাওয়ার আশায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং সে যেন বারোবার কুরআন পাঠ করেছে তাকে তাঁর সাওয়াব দান করবেন। আর যে রোগীর নিকটেই সূরা ইয়া-সীন পাঠ করা হবে তাঁর নিকট প্রত্যেক অক্ষরের সংখ্যায় দশজন করে ফেরেশ্‌তা নেমে আসবে যারা তাঁর সামনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর তাঁর জন্য রহমত কামনা করবে, তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তাঁরা তাঁর আত্মা কবয করা ও গোসল দেওয়ার সময় উপস্থিত থাকবে, তাঁর জানাযার (কফিনের) অনুসরণ করবে, তাঁর সলাত আদায় করবে এবং তাঁর দাফনের সময়ও উপস্থিত থাকবে। আর যে রোগী সূরা ইয়া-সীন পাঠ করবে এমতাবস্থায় যে, সে মৃত্যুর যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছে তাঁর আত্মা সে সময় পর্যন্ত মালাকুল মওত কবয করবে না যে পর্যন্ত জান্নাতের পাহারাদার রিযওয়ান জান্নাতী শরবত নিয়ে উপস্থিত না হবে। অতঃপর সে তাঁর বিছানায় থাকা অবস্থায় পান করবে, এরপর তাঁর মৃত্যু হবে। সে পরিতৃপ্ত অবস্থাতেই থাকবে। সে নবীগণের কোনো হাউযের (পানির) মুখাপেক্ষী হবে না। জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত সে পরিতৃপ্তই থাকবে।"[১২১]

৫. "সূরা ইয়া-সীনকে তাওরাতের মধ্যে আল-মু'ইম্মা নামে ডাকা হতো। কারণ তা দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণকে পাঠকারীর জন্য সম্পৃক্ত করেছে। তা তাঁর থেকে দুনিয়ার বিপদাপদকে দূরে রাখে এবং আখিরাতের বিভীষিকাকে প্রতিহত করে।"[১২২]

৬. "যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে তাঁর পিতা-মাতার কবর যিয়ারাত করে তাদের দু'জনের নিকট অথবা একজনের নিকট সূরা ইয়া-সীন পাঠ করবে তাকে প্রত্যেক আয়াত অথবা অক্ষরের সংখ্যার বিনিময়ে ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[১২৩]

৭. "তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের উপর সূরা ইয়া-সীন পাঠ করো।"[১২৪]

৮. "প্রতি বস্তুরই অন্তর থাকে আর কুরআনের অন্তর হচ্ছে সূরা ইয়া-সীন, যে ব্যক্তি একবার সূরা ইয়া-সীন পাঠ করবে, এ পাঠের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য দশবার কুরআন পাঠ করার সমান সাওয়াব লিখে দিবেন।"[১২৫]

৯. "তুমি তোমার তর্জনী আঙ্গুলি তোমার মাড়ির দাঁতের উপরে রেখে সূরা ইয়াসীনের শেষাংশ পাঠ কর। আ-অ-লাম ইয়ারাল ইনসানু আন্না খলাকনাহু মিন নুতফাতিন।"[১২৬]

১০. "যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে তাঁর পিতা-মাতার অথবা দু'জনের একজনের কবর যিয়ারাত করবে অতঃপর তাঁর নিকট সূরা ইয়া-সীন পাঠ করবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[১২৭]

---

[১১৮] *দেখুন : সিলসিলাহ য'ঈফাহ্ অল-মওযূ'আহ- হা. ১২৪৬।*
[১১৯] *দেখুন : সিলসিলাহ য'ঈফাহ্ অল-মওযূ'আহ- হা. ৫২২১; য'ঈফুত তারগীব অত-তারহীব- হা. ৪৫০।*
[১২০] *এ হাদীস খুবই দুর্বল, য'ঈফ জিদ্দান; দেখুন : সিলসিলাহ য'ঈফাহ্ অল-মওযূ'আহ- হা. ৫১১২।*
[১২১] *হাদীসটি বানোয়াট, দেখুন : য'ঈফাহ্ অল-মওযূ'আহ- হা. ৪৬৩৬।*
[১২২] *হাদীসটি খুবই দুর্বল, দেখুন : য'ঈফাহ্ অল-মওযূ'আহ- ৩২৬০।*
[১২৩] *হাদীসটি বানোয়াট, দেখুন : য'ঈফাহ্ অল-মওযূ'আহ- হা. ৫০।*
[১২৪] *হাদীসটি দুর্বল, মিশকাত- হা. ১৬২২; য'ঈফ আবী দাউদ- হা. ৩১২১; ইরওয়াউল গালীল- হা. ৬৮৮; য'ঈফ জামে'ইস সাগীর- হা. ১০৭২ ও য'ঈফুত তারগীব অত-তারহীব- হা. ৮৮৪।*
[১২৫] *হাদীসটি বানোয়াট, দেখুন : য'ঈফ জামে'ইস সাগীর- হা. ১৯৩৫; য'ঈফ জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৮৮৭।*
[১২৬] *হাদীসটি বানোয়াট, দেখুন : য'ঈফ জামে'ইস সাগীর- হা. ৩৫৮৭; সিলসিলাহ য'ঈফাহ্ অল-মওযূ'আহ- হা. ৩৮১৪।*
[১২৭] *হাদীসটি বানোয়াট, দেখুন : য'ঈফ জামে'ইস সাগীর- হা. ৫৬০৬।*

১১. "যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সূরা ইয়া-সীন পাঠ করবে তাঁর পূর্ববর্তী যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, অতএব তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে সূরা ইয়া-সীন পাঠ করো।"[১২৮]

১২. "যে ব্যক্তি একবার সূরা ইয়া-সীন পাঠ করল সে যেন দশবার কুরআন পাঠ করল।"[১২৯]

১৩. "যে ব্যক্তি রাতে সূরা ইয়া-সীন পাঠ করবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে এ অবস্থায় সে সকাল করবে।"[১৩০]

১৪. "যে ব্যক্তি রাতে সূরা ইয়া-সীন পাঠ করবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[১৩১]

১৫. "যে ব্যক্তি একবার সূরা ইয়া-সীন পাঠ করল সে যেন দু'বার কুরআন পাঠ করল।"[১৩২]

১৬. "জুমু'আর রাতে চার রাকআত সলাত আদায় এবং তাঁর প্রথম রাকআতে সূরা আল ফাতিহার পরে সূরা ইয়া-সীন পাঠ করা মর্মে যে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে এবং তাশাহুদের পরে দীর্ঘ দু'আ উল্লেখ করে যে ফাযীলত বর্ণনা করা হয়েছে সে হাদীসটি বানোয়াট।"[১৩৩]

১৭. "যে ব্যক্তি সকাল বেলা সূরা ইয়া-সীন পাঠ করবে, তাঁর সকল প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করে দেওয়া হবে।"[১৩৪]

১৮. "কুরআনের অন্তর হচ্ছে সূরা ইয়া-সীন, যে ব্যক্তিই আল্লাহ এবং আখিরাতকে লাভের আশায় তা পাঠ করবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অতএব তোমরা মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন পাঠ করো।"[১৩৫]

১৯. "যে ব্যক্তি সূরা ইয়া-সীন পাঠ করে তা পান করবে, তার পেটে এক হাজার নূর, এক হাজার রহমাত, এক হাজার বরকত, এক হাজার ঔষধ প্রবেশ করবে অথবা তাঁর থেকে এক হাজার রোগ বেরিয়ে যাবে।"[১৩৬]

২০. এক কথিত হাদীসের মধ্যে এসেছে– যে ব্যক্তি সূরা ইয়া-সীন শ্রবণ করবে তা তাঁর জন্য বিশ দিনার মহান আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার সমান হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি সূরা ইয়া-সীন পাঠ করবে তা তাঁর জন্য বিশটি হজ্জ আদায়ের সমান হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি লিখবে এবং তাকে পান করাবে তাঁর পেটে এক হাজার ইয়াকীন, এক হাজার নূর, এক হাজার বরকত, এক হাজার রহমাত এবং এক হাজার রিয্‌কের অনুপ্রবেশ ঘটানো হবে এবং তাঁর থেকে সকল প্রকার ঈর্ষা বের করে নেওয়া হবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে তাঁর থেকে সকল প্রকার রোগ বের করে নেওয়া হবে।[১৩৭]

২১. আরেকটি কথিত হাদীসের মধ্যে এসেছে– আবূ ক্বিলাবাহ বলেন, যে ব্যক্তি সূরা ইয়া-সীন পাঠ করবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যে পথভ্রষ্ট থাকা অবস্থায় সূরা ইয়া-সীন পাঠ করবে সে হিদায়াত লাভ করবে। যে ব্যক্তি তাঁর কিছু হারিয়ে যাওয়ার কারণে সূরা ইয়া-সীন পাঠ করবে সে তা পেয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সেই খাদ্যের নিকট সূরা ইয়া-সীন পাঠ করবে যে খাদ্য কম বলে ভয় করছিল তা তাঁর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির নিকট পাঠ করবে তাঁর জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি সন্তান প্রসবের সময় কষ্টে থাকা মহিলার নিকট পাঠ করবে তাঁর জন্য সন্তান প্রসব সহজ করে দেওয়া হবে। আর যে একবার সূরা ইয়া-সীন পাঠ করল সে যেন এগারো বার কুরআন পাঠ করল। আর প্রত্যেক বস্তুর হৃদয় রয়েছে কুরআনের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়া-সীন।[১৩৮]

এছাড়া মৃত ব্যক্তি বা তাঁর কবরের নিকট সূরা আল বাক্বারার প্রথম ও শেষ আয়াতগুলো পাঠ করা মর্মে যে আছার বর্ণিত হয়েছে তা সহীহ নয়। আনসারদের উদ্ধৃতিতে মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন পাঠ করা মর্মে যা কিছু বর্ণনা করা হয়ে থাকে সেগুলোও সহীহ নয়। ❑

---

[১২৮] *হাদীসটি দুর্বল, দেখুন : য'ঈফ জামে'ইস সাগীর- হা. ৫৭৮৫।*
[১২৯] *হাদীসটি বানোয়াট, দেখুন : য'ঈফ জামে'ইস সাগীর- হা. ৫৭৮৬।*
[১৩০] *হাদীসটি দুর্বল, দেখুন : য'ঈফ জামে'ইস সাগীর- হা. ৫৭৮৭।*
[১৩১] *হাদীসটি দুর্বল, দেখুন : য'ঈফ জামে'ইস সাগীর- হা. ৫৭৮৮।*
[১৩২] *হাদীসটি বানোয়াট, দেখুন : য'ঈফ জামে'ইস সাগীর- হা. ৫৭৮৯।*
[১৩৩] *য'ঈফ জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৫৭০।*
[১৩৪] *হাদীসটি মুরসাল হিসেবে আতা ইবনু আবী রাবাহ হতে বর্ণিত হয়েছে। দারেমী বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সহীহ নয়।*
[১৩৫] *হাদীসটি দুর্বল, দেখুন : য'ঈফ জামে'ইস সাগীর- হা. ৮৮৪।*
[১৩৬] *হাদীসটি বানোয়াট, দেখুন : য'ঈফাহ্ অল-মওযূ'আহ- হা. ৩২৯৩।*
[১৩৭] *হাদীসটি বানোয়াট, আল্লামা শাওকানী "আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ" গ্রন্থে (১/৩০০) বলেন, হাদীসটি খাতীব বাগদাদী আলী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু হাদীসটি বানোয়াট। ইবনু আদী বলেন, এ হাদীসটি জাল করার ব্যাপারে আহমাদ ইবনু হারুন অভিযুক্ত।*
[১৩৮] *"কাশফুল খাফা" গ্রন্থে এটি বাইহাক্বীর বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি বানোয়াট, দেখুন : সিলসিলাহ য'ঈফাহ্ অল-মওযূ'আহ- হা. ৩২৯৩।*

ইতিহাস-ঐতিহ্য

শহীদি রক্তে স্নাত ঐতিহাসিক কারবালা

–সহকারী অধ্যাপক মো. আ. সাত্তার ইবনু ইমাম*

[দ্বিতীয় পর্ব]

একটি সিদ্ধান্ত উপনীত হলেন যে, 'উমার ইবনু সা'দ কে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনটি শর্ত আরোপ করলেন যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য। এক নম্বর শর্ত ছিল মদিনায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে। দুই নম্বর শর্ত– না হয়, মক্কায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে, তিন নম্বর শর্ত আরোপ করা হলো এজিদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করার সুযোগ দিতে হবে। এজিদের সিরিয় সেনা প্রধান 'উমার ইবনু সা'দ, 'উবায়দুল্লাহ ইবনু জিয়াদের পুত্র কুফা সেনাপ্রধান আলহোর, নমনীয়তা প্রকাশ করলেও শিমার তা প্রত্যাখ্যান করে এবং যুদ্ধের মাধ্যমে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তার সঙ্গী সাথীদের সমূলে হত্যা করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলে। হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে, কোনো ধরনের সুযোগ প্রদান করা হবে না, এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। কুফাবাসী হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে যোগ দিতে পারে, এতে এজিদের শাসন ক্ষমতা তছনছ হতে পারে। ভয় ছিল শাসনক্ষমতার সাথে যারা সম্পৃক্ত তারা তরবারীর আঘাতে টুকরো টুকরো হতে পারে। একটি রাজ ক্ষমতার পতন হয় বহুপ্রাণের নিধনের মাধ্যমে। বিজয়ী শক্তি, পরাজিত শক্তির উপর সকল দোষ চাপিয়ে হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে সমূলে ধ্বংস করে। বোমেরাং হয়ে ফিরে আসতে পারে, তাই ভয়ে আতঙ্কে থাকে, এটাই মূল কারণ। রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত যারা তারা সব সময়ই নানা দোষে আক্রান্ত থাকে। শাসনের সাথে সাথে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে থাকে। আর প্রতিপক্ষ ঝোপ বুঝে কোপ দিয়ে টুঁটি বিচ্ছিন্ন করে, নিজেদেরকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে, সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণের মাধ্যমে ইতিহাসের গতানুগতিক ধারা চলমান রাখতে চায়। তাই উভয়পক্ষই সচেতন ও সজাগ থাকে। কেউ মাথা নত করতে চায় না, এটাই রাজনৈতিক শাসন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। ৬১ হিজরির ৯ এবং ১০ মুহার্‌রমের মধ্যবর্তী রাতে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন তরবারী পরিষ্কার করছিলেন, আর শিক্ষণীয় কবিতা আবৃত্তি করছিলেন, তার সহধরা বোন জয়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নিকটেই ছিলেন। কবিতা শুনে অঝোরে কান্নার অশ্রুবর্ষণ করতেছিলেন। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, হায়, আফসোস! আমি যদি আজ জীবিত না থাকতাম! হ্যাঁ, আমার নানা আমার পিতা আমার মা এবং আমার ভাই হাসান সকলেই আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। আপনার সহায়ত্বে আমরা, আপনাকে ছাড়া আমরা কিভাবে জীবিত থাকব? তার স্বামী 'আব্দুল্লাহ ইবনু জাফর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেই সময় সিরিয়ায় ছিলেন। যয়নাব সন্তানাদি নিয়ে তখন মদিনায় ছিলেন। আব্দুল্লাহর অনুমতি নিয়ে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সাথে যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র স্নেহধন্য দুই ছেলে আওন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং মুহাম্মদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সাথে নিয়েই কারবালায় গিয়েছিলেন। কারবালার অবস্থা বেগতিক দেখে যয়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) অঝোর ধারায় কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, আপনার পরিবর্তে আমি নিজেই জীবন দিতে চাই। হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রিয় বোনের অন্তর নিংড়ানো কথা শোনে অশ্রু সজল হয়ে উঠলেন। কিন্তু মু'মিনের শানে বললেন : বোন তুমি ধৈর্য ধারণ করো, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন থেকে সান্ত্বনা লাভ করো, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত পৃথিবীর সবকিছুই ধ্বংস হবে। আমাদের জন্য আমাদের নানার আদর্শ। তার উত্তম আদর্শকেই তুমি অনুসরণ করবে। হে প্রিয় বোন! আল্লাহর কসম, আমি যদি হক্ব পথে শেষ হয়ে যাই, তাহলে আমার মৃত্যুতে মাতমে বুক চাপড়িও না, নিজের মুখকে ক্ষতবিক্ষত করো না এবং চিৎকার করে ক্রন্দন করো না। যাত্রাপথে একদল বেদুঈন সঙ্গী হয়েছিলেন, তারা ভেবেছিলেন ইরাকে গিয়ে সুখী হবেন। ইমাম তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে ছিলেন। সেজন্য হুসাইন সকলকে ডেকে বললেন। হে প্রিয় বন্ধুগণ! এইমাত্র আমি বেদনায় বিধূর ভয়ানক সংবাদ পেয়েছি। এতে আমি মর্মাহত হয়েছি, ব্যথিত হয়েছি, আশাহত হয়েছি। কুফার প্রাদেশিক শাসক 'উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ, আকিলের পুত্র মুসলিম, উরওয়ার পুত্র হানি, বকতের পুত্র

* *(এম. ডি. এম. বি.) বি. এ (অনার্স), এম. এ. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (রা. বি.), এম. এ (ডবল), ইসলামিক স্টাডিজ, (রাজশাহী কলেজ), এম. এম. কামিল হাদীস।*

'আব্দুল্লাহকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে এবং তাদের দেহ গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। যারা সঙ্গে থেকে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তারা সকলেই আমার সমর্থক। তাদের লাশটি উদ্ধার করে কাফন দাফনেরও কেউ নেই। হুসাইন বললেন কুফাবাসীরা চরম বিশ্বাসঘাতক। কুফায় আমাদের কেউ নেই। অতএব যারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছো, নির্বিঘ্নে তোমরা চলে যেতে পারো। এতে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না, আমি অসন্তুষ্টও হবো না, আমি কোনো বাধা দেব না। তোমরা যার যার পথ দেখে নিতে পারো। সহচর বেদুঈনগণ হুসাইনকে ছেড়ে চলে গেলো। থেকে গেলেন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আর তাঁর সাথে যাত্রার প্রারম্ভে যারা ছিলেন, শুধু তারাই থাকলেন। যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়লো, আলহোর ইবনু 'উবাইদুল্লাহর সাথে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বাকবিতণ্ডতা হলো।

হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র কারবালার যুদ্ধের প্রারম্ভে বেশ কয়েকটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন। বাকবিতণ্ড হয়েছে, একসাথে জামা'আতে নামায হয়েছে, চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়েছে, কুফাবাসীর উদ্দেশ্যে, প্রতিপক্ষ সৈনিকদের উদ্দেশ্যে, এবং নিজের সাথে সম্পৃক্ত সহচরদের উদ্দেশ্যে আপনজনদের মধ্যে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে নাতিদীর্ঘ উপদেশ মূলক বেশ কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন, কিন্তু কোনো কিছুই আর কাজে আসেনি। যুদ্ধ একেবারেই সন্নিকটে প্রচেষ্টা সবই ব্যাহত। পানির অভাবে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শিবিরে হাহাকার দেখা দিলো। ছোট ছোট শিশু ও বালক-বালিকা পানির পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লো, এইভাবে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পিপাসিত অবস্থায় তিন দিন কেটে গেল। নিরুপায় হয়ে শেষবারের মতো হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উমাইয়াহ্ সেনাদের কাছে অনুরোধ করলেন। ...যেন অসহায় স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের সাথে যুদ্ধ করা না হয় এবং শুধু তার প্রাণসংহার এর মাধ্যমে দ্বন্দ্বের অবসান হয়। উমাইয়াহ্ সেনারা কোনো মায়া মমতার ধার-ধারতোনা। সর্বশেষে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের বলছিলেন, তার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন তাদেরকে যেন জীবন নিয়ে চলে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু বন্ধুবান্ধব আপনজন আত্মীয়-স্বজন কেউ তাদের প্রিয় নেতাকে রেখে, মৃত্যু অবধারিত জেনেও হুসাইনকে পরিহার করতে রাজি হলেন না, রেখে যেতে ও রাজি হলেন না। উবায়দুল্লাহ ইবনু জিয়াদের পুত্র, আলুহোর যিনি কুফার সেনাপ্রধান হয়ে এসেছিলেন, হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। শত্রুপক্ষের এই সেনাপতি আলহোর নবীর বংশের নবীর দৌহিত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পাপ মনে করে, আরো ত্রিশজন অনুচরসহ হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র দলে যোগ দিলেন। হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সঙ্গী সাথীদের নিয়ে দশই মুহার্‌রমের আগের রাত্রিতে সারারাত ধরে প্রার্থনা করে, নামায পড়ে, অঝোর ধারায় চোখের অশ্রু ফেলে, প্রভাত করেছেন। অন্যদিকে 'উমার ইবনু সা'দ-এর নেতৃত্বে চারদিকে ঘিরে রেখেছে এজিদের সিরিয় সৈন্যরা, শীমারের নেতৃত্বে কুফার উবায়দুল্লাহ ইবনু জিয়াদের সৈনিকেরা। 'উবায়দুল্লাহ ইবনু জিয়াদের পুত্র আলহোর, যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কখনো 'উমার ইবনু সা'দ-এর সাথে, কখনো শীমারের সাথে, কখনো কুফার নেতৃবৃন্দের সাথে, কখনো হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সাথে, আলহোরের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হলো। 'উবায়দুল্লাহ ইবনু জিয়াদ এবং এজিদের কড়া হুঁশিয়ারিতে যারা নমনীয় ছিল তারা সকলেই হুসাইন এর বিরুদ্ধে তাদের তরবারি শান দিতে লাগলো। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আলহোর নিরপেক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করল। শত্রুসেনা বেষ্টিত অবস্থায় হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উচ্চৈঃস্বরে সূরা আল ইমরানের ১৭৮, ১৭৯ নং আয়াত পাঠ করছিলেন। এই আয়াত শুনে শত্রুদের ভেতর থেকে একজন চিৎকার করে বলে উঠলো, "কা'বার প্রভুর কসম। আমরাই পবিত্র এবং তোমাদের নিকট হতে আমাদেরকে পৃথক করা হয়েছে।" একটু আগেই উল্লেখ করেছি আলহোর হুসাইনের দলে যোগ দিয়েছে।

ত্রিশজন সেনা নিয়ে ১০ই মুহার্‌রম, ৬১ হিজরির ৬৮০-খ্রিষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর শনিবার কিংবা শুক্রবার 'উমার ইবনু সা'দ প্রভাতেই তার সৈন্য পরিচালনা করলেন। কারবালার প্রান্তরে ঐদিন নারী ও শিশুর আর্তনাদের মধ্যেই দুই অসম দলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো। প্রত্যেকটি খণ্ড ও সম্মুখ যুদ্ধে হুসাইনের ক্ষুদ্র বাহিনীর বীরত্ব অজেয় ছিল। হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার ব্যূহের রচনা করলেন। তাঁর সৈন্য সংখ্যা মোট ৭২ জন। মাত্র ৩২ জন অশ্বারোহী এবং অবশিষ্ট পদাতিক। ব্যূহের দক্ষিণে যোয়াহেরকে স্থাপন করলেন। পতাকা ছিল বৈমাত্রেয় ভ্রাতা 'আব্বাস ইবনু 'আলীর হাতে। যিনি ছিলেন শীমারের ফুফু বাণীনের ছেলে। যুদ্ধ শিবিরের পিছনে খন্দক করে বহু

কাষ্ঠ একত্রিত করে, আগুন জ্বেলে রাখা হয়েছিল, যেন শত্রুরা পিছন থেকে আক্রমণ করতে না পারে।

কারবালার প্রান্তরে শহীদের রক্তের স্রোতে লালে লাল হয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে, পাষণ্ড হৃদয়ে শীমার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র পিছনে এসে জ্বলন্ত অগ্নিকাণ্ড, প্রদক্ষিণ করতে লাগলো। জ্বলন্ত অগ্নি দেখে শীমার চিৎকার করে বলে উঠলো, হোসাইন! কিয়ামত শুরু হওয়ার পূর্বেই তুমি কি অগ্নিকে স্বীকার করে নিয়েছো? হুসাইন শীমারের কটাক্ষপূর্ণ কথা শ্রবণ করে, উত্তর ছুড়ে দিলেন, হে রাখালের পুত্র! প্রজ্জলিত অগ্নির জন্য, তুমি উপযুক্ত। হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র অনুগত সৈনিক মুসলিম ইবনু আওসাজা বললেন, হে আমাদের প্রিয় নেতা! আপনি আমাকে নির্দেশ দিন, এখনই তাকে তীরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করি। এখন সে একেবারেই আমাদের হাতের নাগালে। পাহাড় সমান ধৈর্যের নায়ক, সত্যের অগ্র পথিক, প্রিয় নবীর দৌহিত্র হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি নির্দেশ দিলেন না, তার অনুগত সৈনিক কে শীমারের দিকে তীর নিক্ষেপ করতে। পূর্বে কেউ আঘাত না করলে আমরা শত্রুর প্রতি কোনো আঘাত আগে করব না। *(তথ্যসূত্র : ইবনু জারীর)*

হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিকট যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে একটি হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা। হে আল্লাহ! এই বিপদের দিনে তুমিই একমাত্র আমার ভরসা। সকল দুর্দিনে তুমিই আমার সহায়। অসংখ্য বিপদের সম্মুখীন হচ্ছি, আর অন্তর দুর্বল হচ্ছে, বিপদ হতে উদ্ধার পেতে, সকল ধরনের প্রচেষ্টাই নিঃশেষ হয়ে গেল। চারদিকে শুধু ব্যর্থতার গ্লানির ঝড় বইছে। যুদ্ধ এড়িয়ে, বেরিয়ে যাওয়ার পথ রুদ্ধতার প্রাচীরে আবদ্ধ। বন্ধু যারা ছিল বিশ্বাসঘাতকতা করছে। আমাদের বেষ্টিত শত্রুরা আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠছে, আমি কেবল তোমারই নিকট প্রার্থনা করছি। তুমি আমার বিপদের কাণ্ডারী। প্রভু সকল দয়ার মালিক তুমিই। তুমি করুণাময় রাহমানুর রাহিম। আজও কেবল তোমারই নিকট প্রার্থনা করছি। *(তথ্যসূত্র : মউত কি ইনসানিয়াত, শরহে নাহ্‌জুল বালাগাহ)*

অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শত্রুবাহিনী যখন একেবারেই হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নিকটবর্তী, তখন তিনি উটের পৃষ্ঠে আরোহিত ছিলেন। পবিত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআন সম্মুখে রেখে, শত্রুবাহিনীকে সম্বোধন করে উচ্চস্বরে বলছিলেন : 'তোমরা তাড়াতাড়ি করো না। আমার বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো, আমার উপদেশ গ্রহণ করো, আমার কৈফিয়ৎ শুনে নাও, আমাকে এখানে আসার কারণ বলতে দাও। এখানে আসার কারণ যদি যুক্তিসংগত হয়, তোমরা নির্বিঘ্নে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারো, আমার প্রতি সুবিচার করো, এতে তোমাদের সৌভাগ্যের কারণ হতে পারে এবং আমার সাথে অযথা শত্রুতা হতে বিরত থাকো। আমার বক্তব্য শ্রবণ করে, আমার অভিযোগ যদি গ্রহণ না করো, আর তো দিন নেই বিচার হতে বিরত থাকো, তবে আমার বলার আর কিছুই থাকবে না। তোমরা তোমাদের সৈনিক এক যোগে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। আমাকে অবকাশ না দিয়ে কোনো সুযোগ না দিয়েই আমাকে আক্রমণ করো।' হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য দেওয়ার পরপরই, তার পরিবার-পরিজনের আশ্রিত শিবিরে কান্নার রোল পড়ে গেল ভারী হয়ে উঠলো, সে আওয়াজ শিবির থেকে বাহিরে চলে এলো, হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তা সহজেই বুঝতে পারলেন, জীবনের পরিসমাপ্তির ঘনঘটার আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠলো, সবকিছুই যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। শত্রুরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ক্রমান্বয়ে আরো নিকটবর্তী হচ্ছে। হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও তার ভাই 'আব্বাস এবং তার পুত্র 'আলীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য শিবিরের ভিতর পাঠানো হলো। বলে দিলেন, তারা যেন শান্ত থাকে, এই কান্না, এই ক্রন্দন, এই আহাজারি এখানেই শেষ নয়, সামনে আসছে আরো বহু কান্নার ঢেউ, কান্না আর কান্না। সে কান্না আর শেষ হওয়ার মতো নয়। এ কথা শেষ হতে, না হতেই ব্যাকুলতার ভারে মুহ্যমান পরিস্থিতিতে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "হে আল্লাহ! ইবনু 'আব্বাসকে দীর্ঘ জীবন দান করুন। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মদিনায় থাকাকালীন কুফার পথে পা বাড়াতে নিষেধ করেছিলেন, হৃদয় ভরে পরামর্শ দিয়েছিলেন, বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের সঙ্গে নিতে বারবার নিষেধ করেছিলেন। তখন তিনি 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র পরামর্শ উপদেশ গ্রহণ করেননি। ফোরাতের উপকূলে এসে শোচনীয় পরিস্থিতি অবলোকন করে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সে কথা বারবার স্মরণ হচ্ছে। আশাহত জীবনে মেঘে ঢাকা সময়ে, বিহ্বল চিত্তে তার দীর্ঘায়ু কামনা করলেন। তিনি আবারও তার বক্তৃতা শুরু করলেন। *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

মহিলা জগৎ

ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের*

পৃথিবীতে নারী এবং পুরুষ উভয়েই মহান আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং অন্যতম নিয়ামত। মূলত নারী এবং পুরুষের মধ্যে বেশ কিছু “বৈষম্য” বা “পার্থক্য” রেখেই আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর এ বৈষম্য বা পার্থক্যই মানব সভ্যতার টিকে থাকার মূল ভিত্তি। নারী এবং পুরুষের মাধ্যমেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষ পৃথিবীতে আগমন করে। যদি আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন পৃথিবীতে পুরুষ এবং নারী জাতিকে সৃষ্টি না করতেন তাহলে এই বিশাল পৃথিবীটা মানব শূন্যে পরিণত হতো। পুরুষ এবং নারীর মাধ্যমে পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি করেই শেষ করেননি, তিনি তাদের পরিপূর্ণ, স্নেহ, মমতা দিয়ে লালন-পালন করা এবং তাদের মধ্যে মানবীয় মূল্যবোধগুলো বিকশিত করার মহান দায়িত্বও এই পুরুষ এবং নারীর উপর। আর এ দায়িত্ব পূর্ণ মাত্রায় পালনের জন্য নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে কিছু বৈষম্য বা পার্থক্য করেই তৈরি করেছেন যেগুলোর বিলোপ সাধন করলে মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। এ কারণে মহান আল্লাহর দেওয়া এ বৈষম্য বা পার্থক্যকে পুঁজি করে যেন নারীদেরকে তাদের ন্যায় সংগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা না হয় এবং এ বৈষম্য দূরীকরণ বা সমতা প্রতিষ্ঠার নামে যেন প্রাকৃতিক এ ভারসাম্য বিনষ্ট করা না হয়। এ জন্য ইসলামে নারী ও পুরুষের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মূল দায়িত্ব ও প্রাকৃতিক এ বৈষম্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ফলে নারী হিসেবে তাকে অধিকার বঞ্চিত করা হয়নি; বৈষম্য করা হয়নি বা অবহেলা করাও হয়নি। পক্ষান্তরে সমান অধিকারের নামে তাকে পুরুষের মতো সমান দায়িত্ব দিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করাও হয়নি।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন :

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا﴾

অর্থ : “যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আর তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।”[১৩৯]

সুতরাং কেন পুরুষ হলাম না, নারী জন্মই পাপ! কেন নারী হলাম না! নারীদের কত সুবিধা! ইত্যাদি অমানবিক ও অযৌক্তিক কথা ব্যক্তি সামাজিক জীবনে হতাশা, বিভেদ ও কষ্ট বৃদ্ধি করা ছাড়া কোনোই কাজে লাগে না; বরং আমাদের উচিত আল্লাহ কর্তৃক দেয়া সুযোগ সুবিধার মধ্যে থেকে দায়িত্ব পালন করা ও অধিকার বুঝে নিয়ে আরো উন্নতি, শান্তি, বরকত লাভের জন্য তাঁর অনুগ্রহ কামনা করা। সর্বদা মনে রাখতে হবে নারী এবং পুরুষ কেউই এই পৃথিবীতে নিজের জন্য শুধু বাঁচতে আসেনি; বরং পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে থেকে পৃথিবীকে ভবিষ্যতের জন্য সমৃদ্ধ করা অন্যতম দায়িত্ব। এ জন্য নারীকে শুধু কন্যা, স্ত্রী অথবা মাতা মনে করলে চলবে না। নিম্নে নারীদের অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো–

(১) ধর্মীয় অধিকার : ধর্ম পালন মানুষের জন্মগত অধিকার। সকল মানুষেরই অধিকার আছে ধর্ম পালন, মহান আল্লাহর স্মরণ, প্রার্থনা ইত্যাদির মাধ্যমে তার অশান্ত হৃদয় শান্ত করার ও আত্মিক প্রশান্ত, পরিতৃপ্তি ও আখিরাতের পুরস্কার অর্জন করার। অনেক ধর্মে, জাতি, বংশ, বর্ণ বা লিঙ্গের কারণে অনেক মানুষকে এ জন্মগত ধনী অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম ধর্মে নারী এবং পুরুষকে সকল ধর্মীয় বিষয়ে সমান অধিকার প্রদান করা হয়েছে। তবে সমান দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। যেমন- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও সকল ক্ষেত্রেই নারীরা সমান অধিকার ভোগ করেন। তবে নারী প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে “দায়িত্ব” কিছুটা হালকা করা হয়েছে। যেমন- পুরুষের জন্য জামা‘আতে নামায আদায় করা জরুরি দায়িত্ব। কিন্তু নারীর জন্য তা জরুরি দায়িত্ব নয়। সুযোগ মাত্র। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ﷺ) বলেন :

* *সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও খতীব, মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

[১৩৯] *সূরা আন্ নিসা : ৩২।*

"তোমাদের নারীগণ মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাদেরকে নিষেধ করবে না। তাদেরকে অনুমতি দিবে (অন্য বর্ণনায় তাদেরকে মসজিদে গমনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে না)। মহান আল্লাহর বান্দীদের মসজিদে নামায পড়তে নিষেধ করবে না। তবে বাড়িতে নামায পড়াই তাদের জন্য উত্তম।"[১৪০]

দেখুন নারীর মাতৃত্ব, দুগ্ধদান, পর্দা পালন ও অন্যান্য দায়িত্বের সাথে সংগতি রেখেই তাদের জন্য এ বিধান দেওয়া হয়েছে। সকল প্রকার 'ইবাদতের ক্ষেত্রে এভাবেই নারীদেরকে সমান অধিকার ও সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন, তবে দায়িত্বের ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় রেয়াত দিয়েছেন।

(২) পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার : রাসূল (ﷺ)-এর পূর্বে এবং তাঁর অনেক পরেও অনেক দেশে নারীদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও ছিল না। জন্মের সাথে সাথে তাদেরকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে মারা হতো। স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রীরও বেঁচে থাকার অধিকার ছিল না স্বামীর চিতায় তাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ দিতে হতো। শিক্ষা, কর্ম, চাকরি, বিবাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের নারীদের কোনো অধিকারই ছিল না; তাদের মতামতের কোনো মূল্যই দেওয়া হতো না। অথচ ইসলাম ধর্মে শুধুমাত্র নারী প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সকল ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছেন। বিবাহ ও পরিবার গঠনে পুরুষ ও নারী উভয়ের পছন্দ ও মতামতকে সমান অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এক কথায় ইসলাম ধর্মই পারিবারিক জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রাকৃতিক পার্থক্য ও দায়িত্বের ভারসাম্য বজায় রেখে সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে।

(৩) অর্থনৈতিক অধিকার : বিশ্বের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূল (ﷺ)-এর আগমনের পূর্বে নারীর অধিকারের বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। পিতার সম্পত্তিতে কন্যার কোনো অধিকারই ছিল না। এমনকি নারীর সম্পদ অর্জনেরও কোনো অধিকার ছিল না। তাই উনবিংশ শতক থেকে বিবাহিত নারীদের স্বতন্ত্রভাবে সম্পদ অর্জনের অধিকার দিয়ে ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে নিউ ইয়র্ক স্পেনে The Married Women's property Act পাস করা হয়; যাতে বলা হয় Its was The tirst Law that clearly established the idea that a married woman had an independent legal identity.[১৪১]

অথচ ইসলাম ধর্মে প্রথম থেকেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের সম অধিকার নিশ্চিত করেছে। বিবাহিত ও অবিবাহিত সকল অবস্থায় একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের মতো একইভাবে ব্যবসা, বাণিজ্য, চুক্তি, সম্পদ অর্জন, সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার সংরক্ষণ করেন। এ ক্ষেত্রে পিতা, স্বামীরা অন্য কারো কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দেওয়া হয়নি।[১৪২]

অর্থনৈতিক অধিকার মূলত পরিবারের সাথে জড়িত। এটি মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। ইসলামের পূর্বে এবং পরেও উনবিংশ শতক পর্যন্ত হিন্দু ধর্ম, ইয়াহূদী খ্রিষ্টান ধর্ম ও অন্যান্য ধর্মে পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার লাভ করেনি। পক্ষান্তরে ইসলামে নারীর জন্য পুরুষের পাশাপাশি উত্তরাধিকার লাভের বিষয় সুনিশ্চিত করা হয়েছে। নারীকে পুরুষের অর্ধেক উত্তরাধিকার প্রদান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়,অর্থনৈতিক দায়িত্বে নারীদেরকে একেবারে দায়িত্ব মুক্ত করে বিশেষ সুবিধা প্রদান করেছে।

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! নারী তার পিতার সম্পত্তিতে যে পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় এটি দেখে কখনও মনে করার সুযোগ নেই যে, নারীর প্রতি ইসলামে বৈষম্য করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি সুন্দর উদাহরণ হচ্ছে– একজন পিতা ১০ লক্ষ টাকার সম্পদ এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে মৃত্যু বরণ করলেন। ইসলামী ব্যবস্থায় পুত্র সাড়ে ছয় লাখ টাকা এবং কন্যা সাড়ে তিন লাখ টাকা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করবেন। বিবাহের সময় পুত্র আনুমানিক এক লক্ষ টাকার মোহর তার স্ত্রীকে দিবে এবং কন্যা এক লক্ষ টাকা তার স্বামীর নিকট হতে মোহর হিসাবে লাভ করবে। ফলে পুত্রের হচ্ছে সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা এবং কন্যার হয়ে গেল সাড়ে চার লক্ষ টাকা। মনে করেন তাদের ছোট ঐ পরিবারের মাসিক খরচ হয় পাঁচ হাজার টাকা পুত্র তার সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা হতে প্রতি মাসে সংসারে খরচ বাবদ পাঁচ হাজার টাকা খরচ করেন। পক্ষান্তরে কন্যার কিন্তু একটি পয়সাও খরচ করতে হচ্ছে না। কারণ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় স্ত্রী এবং সন্তানের যাবতীয় খরচ বহনের দায়িত্ব স্বামীর। নারী যদি কখনও বিধবা বা পরিত্যাক্তা হয় তাহলে শুধু তার নিজের ব্যয়ভার বহন করতে হয়। সন্তানদের খরচের দায়িত্ব স্বামীর পরিবার

[১৪০] *সহীহুল বুখারী- ১/৩০৫; সহীহ মুসলিম- ১/৩২৬।*
[১৪১] *খুৎবাতুল ইসলাম- পৃ. ২২৩।*
[১৪২] *খুৎবাতুল ইসলাম- পৃ. ২২৬।*

বা রাষ্ট্রের। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নারীকে পুরুষের প্রায় সমান অর্থনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সকল অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। তবে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, কোনো নারী যদি সংসারের সমুদয় খরচ স্বামীর নিকট হতে আদায় করে নিজের স্বাধীনতার নামে নিজের সংসার এবং সন্তানদের সেবায় নিয়োজিত না হয়ে চাকরিসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে তাহলে দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে মহান আল্লাহর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। আর যদি নিতান্তই প্রয়োজন হয় তাহলে নারী পুরুষের মতো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সবকিছু করতে পারবেন ঠিকই কিন্তু সেটি অবশ্যই ইসলামের বিধানের মধ্যে থেকে করতে হবে।

(৪) ওয়াসীয়ত করা : পুরুষদের মতো মহিলারাও জীবিত অবস্থাতেই তার মালের এক তৃতীয়াংশ দান করতে পারবেন ওয়াসীয়তের মাধ্যমে। তার মৃত্যুর পর কোনো রকম প্রতিরোধ ব্যতীতই এটা কার্যকরী হবে। কারো সাধ্য নেই তা অস্বীকার করা। কারণ ওয়াসীয়ত করার অধিকার সকলেরই সমান। যেমন পুরুষরাও তা পারবে, তেমন মহিলারাও। কারণ আখিরাতের সওয়াব সকলেরই প্রয়োজন। এ জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا تُقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾

অর্থ : "তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য যে সমস্ত নেক কাজ করবে তা উপস্থিত পাবে আল্লাহর সকাশে আরো উত্তম ও মহান হিসেবে।"[১৪৩]

(৫) স্বামীর জন্য সাজগোজ করা নারীদের একটি বড় অধিকার : নারীদেরকে তাদের স্বামীর জন্য উত্তমরূপে সাজগোজ করার অধিকার ইসলামে দেওয়া হয়েছে। তবে খেয়াল রাখতে হবে সেটি যেন কাফেরদের মতো কোনো পোশাক না হয় এবং স্বামীর জন্য ছাড়া অন্যকে দেখানোর জন্য না হয়।

অতএব আমাদের মূল দায়িত্ব হলো নারী এবং পুরুষের অধিকার এবং দায়িত্ববোধের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। বিশেষ করে নারীত্বের কারণে নারীর প্রতি বৈষম্য দৈহিক বা সামাজিক দুর্বলতার কারণে যেন নারী কখনও বৈষম্যের শিকার না হয় সেদিকে আমাদের সকলের লক্ষ্য রাখা উচিৎ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে বিষয়গুলো মেনে চলার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ❑

[১৪৩] *সূরা আল মুযযাম্মিল : ২০।*

সর্বোচ্চ কতটুকু গরম সহ্য করতে পারে মানুষ?

[৩৯ পৃষ্ঠার পর]

গবেষণার সংগৃহীত তথ্যে উঠে এসেছে, গরম আর আর্দ্র আবহাওয়ায় মানুষের শরীরের বিপাকীয় হার বেড়ে যায়। ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মানুষের বিপাকীয় হারের পরিবর্তন হয় ৩৫ শতাংশ। আর ২৮ থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মানুষের শরীরকে তাপ তৈরি অথবা তাপ অপসারণের কাজ করতে হয় না।

রোহ্যাম্পটন ইউনিভার্সিটির জীবন ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের অধ্যাপক লুইস হ্যালসি বলেন, 'বর্তমান উষ্ণায়নের বিশ্বে গবেষণার ফলাফল আরও বেশি মূল্যবান।'

গরম কেবল শুরু, বিজ্ঞানীদের সতর্কতা : বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে বলে সতর্কতা জারি করেছেন বিজ্ঞানীরা। 'ভবিষ্যতে আরও তীব্র তাপপ্রবাহের জন্য' মানুষ নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের গ্লোবাল চেঞ্জ সায়েন্সের অধ্যাপক সাইমন লুইস এ কথা জানান। বলেন, 'এটি কেবল শুরু।' মাত্র ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা বৃদ্ধিতেই পৃথিবীর অবস্থা সংকটপূর্ণ হয়েছে। ২১০০ সালের মধ্যে আমাদের পৃথিবীর উষ্ণতাকে ২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিয়ে যেতে পারে, যা সত্যিই ভয়ংকর।'

সাইমন লুইস বলেন, 'অতিরিক্ত তাপমাত্রার সঙ্গে মানুষকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।' 'সবার জন্য একটি বাসযোগ্য ও টেকসই ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার সুযোগ দ্রুত কমে যাচ্ছে। গভীর, দ্রুত ও টেকসই কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ শূন্যে নামিয়ে আনলে তা কার্বন নিঃসরণকে কমাতে পারে', জানান তিনি। *[সূত্র : যুগান্তর অনলাইন]*

মৃত্যু সংবাদ

বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি ও আলুকদিয়া শাখার সভাপতি মোহাম্মদ আবুল হোসেন গত ১৪ জুলাই শুক্রবার রাতে খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন– "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন"। মরহুমের জানাযা পরদিন শনিবার সকাল ১০টায় আলুকদিয়া ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তের সভাপতি সৈয়দ রওনাকুল ইসলাম মাইয়্যিতের মাগফিরাতের জন্য এলাকা জমঈয়তের পক্ষ থেকে সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিজ্ঞান-বিস্ময়

গুগল ম্যাপে আপনার বাসা দেখা গেলে সমূহ বিপদ

অধিকাংশ মানুষ কৌতূহলী হয়ে গুগল ম্যাপে নিজেদের বাড়ির অবস্থান খুঁজি, দেখার চেষ্টা করি ম্যাপে বাড়িটি দেখতে কেমন লাগে। তবে অনেকেই নিজেদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে গুগল ম্যাপে বাড়ির সুনির্দিষ্ট তথ্য রাখতে স্বচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। সুখবর হচ্ছে– ইচ্ছা করলে ম্যাপ থেকে বাড়ির ছবি ঝাপসা করে দেওয়া যায় এবং গুগল স্ট্রিট ভিউ থেকেও বাড়ির তথ্য লুকিয়ে রাখা যায়।

কেন বাড়ির ছবি ঝাপসা করা উচিত?

মূল কারণ নিরাপত্তা। ইন্টারনেটের প্রসারের ফলে জীবনের নানা ক্ষেত্রে ঝুঁকি বেড়েছে। যে কোনো ব্যাপারে খুব সহজেই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে ইন্টারনেটে, যা অনেকের জন্যই নিরাপত্তাঝুঁকি তৈরি করছে।

ম্যাপ বা স্ট্রিট ভিউতে আপনার বাড়ির ছবি দেখে কোনো চোর বা ডাকাত সহজেই আপনার বাড়িতে চুরির পরিকল্পনা করতে পারবে। এমনকি চুরি শেষে সেখান থেকে বের হওয়ার সবচেয়ে সহজ পথটিও আগে থেকে চিহ্নিত করে রাখা সম্ভব।

যেহেতু ম্যাপে অনেক সময়ই বাড়ির ভেতরের আঙিনা, এমনকি বাসার ভেতরের ছবিও থাকে, তাই এ ধরনের ঝুঁকি কিছুটা হলেও থেকেই যায়। এ জন্য অনেক পরিবার ম্যাপে তাদের বাড়ির ছবি ঝাপসা করে রাখে। চাইলে ম্যাপ থেকে বাড়ির তথ্য মুছেও ফেলতে পারেন।

যেভাবে করবেন : যদি সিদ্ধান্ত নেন গুগল ম্যাপ থেকে আপনার বাড়ির ছবি মুছে ফেলবেন, তাহলে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন–

১. কম্পিউটার থেকে গুগল ম্যাপ খুলুন। দুঃখজনকভাবে এই কাজটি মোবাইল অ্যাপ থেকে করা যাবে না। এজন্য আপনাকে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের ব্রাউজার থেকে গুগল ম্যাপ ওপেন করতে হবে।

২. ম্যাপে বাড়িটি খুঁজে বের করুন। হয়তো বাড়ির ছবি আসতে পারে। ছবিতে ক্লিক করুন। এবার আপনার বাড়ির স্ট্রিট ভিউ দেখতে পাবেন। অথবা স্ক্রিনের একদম ডান পাশে নিচের দিকে হলুদ রঙের মানুষের আইকনে ক্লিক করেও স্ট্রিট ভিউ ওপেন করতে পারবেন।

৩. 'রিপোর্ট এ প্রবলেম' বাটনে ক্লিক করুন। স্ক্রিনের নিচের দিকে ডান পাশে কোনায় এই বাটনটি আছে।

৪. এবার কোন অংশটি ব্লার বা ঝাপসা করতে চান, সেটি নির্বাচন করুন। স্ক্রিনে লাল-কালো রঙের একটি বক্স আসবে এবং যে অংশটি ঝাপসা করতে চান, সেই অংশটিকে বক্সের মধ্যে রাখতে হবে।

৫. এবার আপনি কী ঝাপসা করার আবেদন করছেন, তালিকা থেকে সেটি নির্বাচন করুন। এখানে আপনার মুখাবয়ব, বাড়ি, গাড়ি, গাড়ির নম্বরপ্লেট, ইত্যাদির একটি তালিকা আছে। আপনি যা ঝাপসা করতে চান, সেটি নির্বাচন করুন। নির্বাচন করার পর কেন ঝাপসা করার জন্য আবেদন করছেন, তার কারণ বর্ণনার জন্য একটি বক্স থাকবে। সেখানে আপনি বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে পারেন অথবা শুধু 'নিরাপত্তাজনিত কারণ' লিখতে পারেন।

৬. একটু স্ক্রল করে নিচের দিকে নামলে ইমেইল ঠিকানা দেওয়ার ঘরে আপনার ইমেইল দিন এবং ক্যাপচা ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করুন। এবার সাবমিট করুন।

আপনাকে একটি ইমেইলের মাধ্যমে জানানো হবে আবেদনটি জমা হয়েছে। পরে গুগল আপনার আবেদনটি গ্রহণ করেছে নাকি বাতিল করেছে, তাও ইমেইলের মাধ্যমে জানিয়ে দেবে। *[সূত্র : রিডার্স ডাইজেস্ট, ম্যাশেবল; যুগান্তর অনলাইন]*

সর্বোচ্চ কতটুকু গরম সহ্য করতে পারে মানুষ?

মানবদেহে তাপমাত্রা সহনশীলতার একটি নির্দিষ্ট পরিসীমা রয়েছে। মানুষের শরীরের জন্য সর্বোচ্চ সংকটপূর্ণ তাপমাত্রা হতে পারে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে শুরু করে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা অতিক্রম করলে মানুষের বিপাকীয় হারের মাত্রা বেড়ে যায়। রোহ্যাম্পটন ইউনিভার্সিটির একদল গবেষকের প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণাটি বৃহস্পতিবার স্কটল্যান্ডের বার্ষিক সোসাইটি ফর এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজি কনফারেন্সে উপস্থাপন করা হয়। গবেষণাটিতে হিট স্ট্রেসে মানবদেহের প্রতিক্রিয়ার ধরণ, অভিযোজন ক্ষমতা, অভিযোজনের সীমাবদ্ধতা আর প্রতিক্রিয়া বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য জানানো হয়েছে। এপি।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে সাধাণরত 'হিট স্ট্রেস' তৈরি হয়। ফলস্বরূপ বিভ্রান্তি, বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরা, মাথাব্যথা বা অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে কেউ কেউ।

২০২১ সালে পরিচালিত গবেষণায় অংশ নেন চারজন পুরুষ ও তিনজন নারী। ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৬০ মিনিট ধরে অংশগ্রহণকারীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের হার, বিপাকীয় হার আর হৃদস্পন্দন পরিমাপ করা হয়। তাপমাত্রা বাড়তে থাকার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস ভারি আর হৃদস্পন্দন বাড়তে থাকে বলে জানান তারা। *[৩৮ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

কবিতা

পূর্ণিমার কালো ছায়া

মোল্লা মাজেদ★

পূর্ণিমার কালোছায়া দোল ভেঙে দোলা দেয়
আমার মনে
বোশেখের দুরন্ত বাতাস তছনছ করে দেয়
সংগোপনে।
অনাবিল শান্তির পায়রাগুলো লুকোলো কোথায়
কোন খানে
তসির বয়াতির জরাজীর্ণ পূর্ণ বুক
বেসুরো গানে।
বিষাদের কালো ডানা ঝপট ঝাপটায়
রাঘব শকুন
জরিনার জটলা চুলে বাসা বেঁধে প্রমোদ করে
উগ্র উকুন।
এখানে ভয়াবহতায় ঘেরা রক্তিম রঙ ধরে
ধূসর আকাশ
জন্মাদের আগ্রাসনে কামনার তীব্রতায়
মানবতার মহা সর্বনাশ।
পশুত্বের পাপাচারে দগ্ধিভূত অঙ্গার
জ্বলে পুড়ে ছাই এই অবোধ মানুষ
একটু খানি নিরাপদ শান্তির অন্বেষণে
ভেঙে দিতে শৃঙ্খল হারিয়েছে হুঁশ।
এখানে জাগ্রত সদা ক্ষমতার ধ্বজাধারী
মানুষের মন গড়া কল্পিত মতবাদ
এখানে বিলুপ্ত প্রায় ধর্মীয় অনুভূতি
গুমড়ে ফেরে দ্বারে দ্বারে সব ফরিয়াদ
এখানে স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী কিছু
স্ব-ঘোষিত বুদ্ধিজীবী নাকি গুণীজন
ক্ষমতার ছত্রছায়ায় তেজোদীপ্ত অবয়ব
আপন প্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত সারাক্ষণ।
কখন উদয় হবে পুবের আকাশ জুড়ে টকটকে লাল হয়ে
রঙিন তপন
এ দেশের এ মাটিতে এ আলোয় ভেসে যেতে ইচ্ছে জাগে
চোখে তাই সুখের স্বপন।
অনাবিল শান্তির পায়রাগুলো খুঁজে ফেরে মনে মনে
অতি সংগোপনে
জাগ্রত জনতার উদ্ধত মিছিলে মুখরিত চারদিক
সংগ্রামী গানে।
অনাবিল শান্তির পায়রাগুলো লুকোলো কোথায়
কোন খানে
কেফাতুল্যা ফয়েজ মাঝির যুগল দুহিতার কথা
ক-জনে জানে?
হাড় ভেঙে হাড় খায় ঘুমন্ত নদীর তীরে
এক ঝাঁক লকলকে চিল
থুর থুরে বট গাছ গাং হতে সেও চায় নিরাপদ
শান্তি অনাবিল।
পঙ্গু পরান মাঝির দিন-কাল কোনো হালে কাটে
কেউ কি জানে
পুলক চন্দন দাসীর কপোল বেয়ে অশ্রু ঝরে
কোন অভিমানে?
জানিনা সাগর কখন ঢেউ ভেঙে একেবারে
নদী হয়ে গেছে
কখন প্রখর রবি তাপ হেরে শেষটায়
পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে আছে।
পূর্ণিমার চাঁদ সেও বিবর্ণ কদাকার
তিমির নিশার মত একদম চুপ
আমার জীবন ঘিরে মৃদ-মন্দ গন্ধ
ছড়ায় ক্ষীণকায় এক রাশ কংকাল ধূপ। ⁂

★ *রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*

জমঈয়ত সংবাদ

বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তের উদ্যোগে সাংগঠনিক সফর

গত ১৪ জুলাই শুক্রবার বাদ জুমুআ বাগেরহাট সদর এলাকার জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে চরগ্রাম খেয়াঘাট শাখায় এক সংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন চরগ্রাম খেয়াঘাট আহলে হাদীস জামে মসজিদ ও শাখা জমঈয়তের সভাপতি মুহাম্মদ ইউসুফ আলী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শাখা সেক্রেটারি মো. মারুফুর রহমান। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় বাগেরহাট সদর এলাকা জমঈয়তের সভাপতি সৈয়দ রওনাকুল ইসলাম এলাকা জমঈয়তের সাংগঠনিক কর্মসূচি সম্বন্ধে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন এবং সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

এছাড়াও বাগেরহাট সদর এলাকার জমঈয়তের সেক্রেটারি মো. সাখাওয়াতুল ইসলাম ও খেয়াঘাট মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি ও এলাকা জমঈয়তের সদস্য মো. সাইফুল ইসলাম জমঈয়তের কাজকে বেগবান করার জন্য বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর জেলা জমঈয়ত সেক্রেটারি মো. আলতাফ হোসেন আগামী নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সম্মেলন সফল করার জন্য সকল শাখা সফরসহ সকল কমিটিকে পুনঃগঠন করার তাকিদ প্রদান করেন।

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

ডেঙ্গু জ্বর : এডিস মশা সম্পর্কে যেসব তথ্য জানা দরকার

বাংলাদেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করার পর ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণু বহনকারী এডিস মশা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি হয়েছে মানুষের মধ্যে।

এডিস মশা খালি চোখে দেখে চেনা যায় কিনা, এটি কখন কামড়ায় অথবা এ মশা শরীরের বিশেষ কোনো জায়গায় কামড়ায় কিনা –বাংলাদেশের সামাজিক মাধ্যমে সাধারণ মানুষ এরকম প্রশ্ন তুলছেন।

এডিস মশা দেখতে কেমন হয়?

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু বিষয়ক কর্মসূচির ব্যবস্থাপক এম. এম. আখতারুজ্জামান জানান ডেঙ্গুর জীবাণু বহনকারী এডিস মশা খালি চোখে দেখে শনাক্ত করা সম্ভব। "এই জাতীয় মশার দেহে সাদা কালো ডোরাকাটা দাগ থাকে, যে কারণে এটিকে টাইগার মশা বলা হয়।" এই জাতীয় মশা মাঝারি আকারের হয়ে থাকে এবং এর অ্যান্টেনা বা শুঙ্গটি কিছুটা লোমশ হয়। "এডিস মশার অ্যান্টেনায় অনেকটা দাড়ির মত থাকে। পুরুষ মশার অ্যান্টেনা স্ত্রী মশার চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি লোমশ দেখায়।" দেহের ডোরাকাটা দাগ এবং অ্যান্টেনা দেখে এডিস মশা চেনা সম্ভব বলে জানান আখতারুজ্জামান।

এডিস মশা কি শুধু সকালে কামড়ায়?

শুধুমাত্র দিনের আলো থাকাকালীন সময়েই এডিস মশা কামড়ায় বলে নিশ্চিত করেন ডা. আখতারুজ্জামান।

"সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এডিস মশা কামড়ায়। তবে কামড়ানোর হার সবচেয়ে বেশি থাকে সূর্যোদয়ের পর দুই-তিন ঘণ্টা এবং সূর্যাস্তের আগের কয়েক ঘণ্টা।"

রাতে এডিস মশা কামড়ায় না বলে নিশ্চিত করেন ডা. আখতারুজ্জামান।

শুধু কি পায়েই কামড়ায় এডিস মশা?

এডিস মশা শুধু মানুষের পায়েই কামড়ায় –সম্প্রতি বাংলাদেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমে এই বিষয়টি ছড়িয়ে পড়েছে।

তবে ডা. আখতারুজ্জামান বলেন, এডিস মশা যে শুধু পায়ে কামড়ায় –এই দাবি ভিত্তিহীন।

"মশা সাধারণত মানুষের পায়েই কামড়ায়, কারণ সাধারণত শরীরে পা-ই অনাবৃত থাকে। তবে শুধু যে পায়েই মশা কামড়ায়, বিষয়টি এরকম নয়।"

এডিস মশা একবার কামড়ালেই কী ডেঙ্গু হয়?

এডিস মশা কামড়ালে যে মানুষের ডেঙ্গুজ্বর হবেই, বিষয়টি এমন নয় বলে জানান ডা. আখতারুজ্জামান। পরিবেশে উপস্থিত ভাইরাস এডিস মশার মধ্যে সংক্রমিত হলে সেই মশার কামড়ে ডেঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। "এডিস মশা ভাইরাস সংক্রমিত থাকা অবস্থায় মানুষকে কামড়ালে সুস্থ মানুষের ডেঙ্গু হতে পারে।" ভাইরাসের কারণে হওয়া জ্বরে আক্রান্ত থাকা ব্যক্তিকে এডিস মশা কামড়ালেও মশার মধ্যে ভাইরাস সংক্রমণ হওয়ার সুযোগ থাকে বলে জানান ডা. আখতারুজ্জামান। "এডিস মশার একটা বিষয় হলো, তারা সাধারণত একাধিক ব্যক্তিকে কামড়ায়। তাই ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির শরীর থেকে এডিস মশার মধ্যে ভাইরাস সংক্রমণ হওয়ার পর ঐ মশার কামড়ে ডেঙ্গু হয়।"

[সূত্র : একুশে টেলিভিশন অনলাইন; বিবিসি বাংলা]

ডেঙ্গু রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা

দেশে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। গবেষণা বলছে, এ বছর অধিকাংশ ডেঙ্গু রোগী 'ডেন ৩' ধরন দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন। তাই জটিলতাও বেশি। ডেঙ্গু জ্বর নানা রকম জটিলতা তৈরি করতে পারে। শুরু থেকেই সতর্ক ও সচেতন থাকলে মৃত্যুঝুঁকিসহ অন্যান্য জটিলতা কমে। তাই যেকোনো জ্বরকে আমলে এনে বাড়িতেই ডেঙ্গু রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে ডেঙ্গু জ্বর সাধারণত জুন-জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্যন্ত হয়ে থাকে। বর্ষাকালে যেকোনো জ্বর হলেই আমাদের দেশে ডেঙ্গুর কথা মাথায় রাখতে হবে। সাধারণত এই জ্বর হয়ে থাকে অতিরিক্ত মাত্রার, ১০২ থেকে ১০৫ ফারেনহাইট। জ্বরের সঙ্গে আরও যেসব উপসর্গ থাকে, তা হলো তীব্র শরীরব্যথা, পিঠে এবং মাংসে ব্যথা, চোখের চারপাশে এবং পেছনে ব্যথা, বমি বমি ভাব অথবা বমি, পেটে ব্যথা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, স্বাদের পরিবর্তন এবং গায়ে লালচে ভাব। এ সময় জ্বরে আক্রান্ত হলে কালক্ষেপণ না করে জ্বরের শুরুতেই প্রথম পাঁচ দিনের মধ্যে ডেঙ্গু এনএসওয়ান টেস্ট করে নেওয়া প্রয়োজন। এর সঙ্গে প্রয়োজন সিবিসি, এসজিপিটি, এসজিওটি টেস্ট করা। কারণ, এবার একটু দ্রুতই কিছু বুঝে ওঠার আগেই জটিলতা বাড়তে দেখা যাচ্ছে।

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বাসায় প্রাথমিক পরিচর্যা ও চিকিৎসা শুরু করতে হবে। আরও যা মানতে হবে–

জ্বর কমানোর উপায় : ডেঙ্গুর উচ্চমাত্রার জ্বর কমানোর জন্য শুধু প্যারাসিটামলজাতীয় ওষুধ ব্যবহার করুন। প্যারাসিটামল ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা পরপর জ্বরের মাত্রা বুঝে ব্যবহার করা যাবে। দিনে ৮ থেকে ১০টি ট্যাবলেটের (সর্বোচ্চ ৪ গ্রাম) বেশি ব্যবহৃত হলে লিভারের ক্ষতিসহ নানা জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। জ্বর কমাতে কোনোভাবেই অ্যাসপিরিন অথবা ব্যথানাশক এনএসএইড গ্রুপের ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না। ওষুধ ছাড়াও জ্বর কমাতে মাথায় পানি ঢালা, শরীর মুছে দেওয়া অথবা রোগীকে গোসল করাতে পারেন।

পানি পান : ডেঙ্গু রোগীর প্রতিদিন আড়াই থেকে তিন লিটার পানি পান করতে হবে। ডেঙ্গু জ্বরের প্রধান চিকিৎসা হলো ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট বা তরল ব্যবস্থাপনা। পানির সঙ্গে খেতে পারেন ওরস্যালাইন, স্যুপ, ডাবের পানি, ফলের শরবত, ভাতের মাড়, দুধ ইত্যাদি।

বিশ্রাম : ডেঙ্গু রোগীদের জন্য বিশ্রাম খুব গুরুত্বপূর্ণ। রোগীদের শারীরিক দুর্বলতাটাও থাকে অত্যধিক। উপসর্গের ৭ থেকে ১০ দিন ভারি কাজ, মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করা যাবে না। রোগী স্বাভাবিক হাঁটাচলা, দৈনন্দিন কাজ করতে পারবেন। তবে ছুটি নিয়ে বাড়িতে অবস্থান করবেন আর পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেবেন।

অন্যান্য ওষুধ : জ্বরের পাশাপাশি অনেকের বমি ভাব, ডায়রিয়া থেকে থাকে। এসব উপসর্গ নিরাময়ে আরও কিছু ওষুধ চিকিৎসকেরা দিয়ে থাকেন। তবে ডেঙ্গু রোগীদের অ্যান্টিবায়োটিক, স্টেরয়েডজাতীয় ওষুধের কোনো প্রয়োজন নেই।

সতর্কসংকেত : রোগীর কিছু সতর্কসংকেত জেনে রাখতে হবে এবং এসব উপসর্গ দেখা দিলে দেরি না করে অবশ্যই ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে অথবা হাসপাতালে চলে যেতে হবে। সেগুলো হলো অস্বাভাবিক দুর্বলতা, অসংলগ্ন কথা বলা, অনবরত বমি, তীব্র পেটে ব্যথা, গায়ে লাল ছোপ ছোপ দাগ, শ্বাসকষ্ট, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, প্রস্রাবে রক্ত, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া অথবা রোগীর মুখ, নাক, দাঁতের মাড়ি, পাছুপথে রক্তক্ষরণ, অতিরিক্ত মাসিকের রক্তক্ষরণ, রক্তবমি।

অতিরিক্ত ঝুঁকিতে কারা : অনূর্ধ্ব ১ বছর অথবা ৬৫ বছরের ওপরে, গর্ভবতী নারী, দৈহিক স্থূলতা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হার্টের সমস্যা, ডায়ালাইসিসের রোগী। এসব রোগীকে শুরু থেকেই হাসপাতালে থাকার পরামর্শ দেয়া হয়। *[সূত্র : একুশে টেলিভিশন অনলাইন]*

প্রোস্টেট গ্রন্থি বড় হয় কেন, কী করবেন?

প্রোস্টেট গ্রন্থির সমস্যায় অনেকেই ভুগেন। অহেতুক লাজ-লজ্জায় কাউকে বলেন না। এতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠে। প্রোস্টেট পুরুষদের ইন্টারনাল অর্গানের মধ্যে গুরুত্বর্পূণ অঙ্গ। এটি একটি সুপারির মতো মাংসপিণ্ড, যা পুরুষের মূত্রথলির নিচে মূত্রনালিকে ঘিরে থাকে। এর প্রধান কাজ শুক্রাণুর জন্য খাদ্যের যোগান দেওয়া।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন ডা. এস এম আব্দুল আজিজ।

বৃদ্ধির কারণ : বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহের হরমোনেও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে। হরমোনের এই পরিবর্তনকেই প্রোস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধির কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। পঞ্চাশ উর্ধ্বে প্রায় সব পুরুষের প্রোস্টেট বড় হতে থাকে কিন্তু সবার উপসর্গ দেখা দেয় না।

বৃদ্ধির ফলাফল : প্রথমত, মূত্রনালির চারদিকে প্রোস্টেটের কোষ সংখ্যা বেড়ে মূত্রনালিকে চেপে ধরে।

দ্বিতীয়ত, প্রোস্টেট গ্রন্থির মধ্যভাগ বৃদ্ধি পেয়ে মূত্রনালির বাহির পথকে আটকে দেয়। ফলে মূত্রথলি থেকে সহজে প্রস্রাব বের হতে পারে না।

উপর্সগ : ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হওয়া, প্রস্রাব করার পরও প্রস্রাবের থলি খালি না হওয়া, প্রস্রাবের বেগ আটকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়, প্রস্রাবের গতি দুর্বল ও মাঝপথে বন্ধ হয়, প্রস্রাবের থলি বেশি ভরে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয় ও অনেক সময় প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত যায়।

প্রস্রাব একেবারে আটকে যাওয়া বা আটকানোর মতো হয়। হঠাৎ করে প্রস্রাব আটকে গেলে তলপেটে তীব্র ব্যথা ও প্রচণ্ড প্রস্রাবের চাপ অনুভূত হয়। প্রোস্টেটজনিত সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া বিশেষত রাতে।

চিকিৎসা : চল্লিশোর্ধ্বে পুরুষদের বছরে অন্তত একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি প্রোস্টেট-পরীক্ষা করানো উচিত। প্রোস্টেট গ্রন্থি বাড়লে অনেক সমস্যা হতে পারে। প্রোস্টেটের সমস্যাকে হালকা করে দেখা উচিত নয়। এই গ্রন্থটি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায়। এই বৃদ্ধি কারও কারও ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করে এবং কারও কারও ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করে না বা সামান্য অসুবিধা সৃষ্টি করে।

ক্ষেত্রবিশেষ প্রোস্টেট বৃদ্ধিজনিত উপসর্গগুলো মেডিসিন প্রয়োগের মাধ্যমে উপশম লাভ করা যায়। ওষুধ প্রোস্টেটের মাংশপেশিগুলো শিথিল করে প্রস্রাবের বাধা দূর করে। *[দৈনিক যুগান্তর অনলাইন]*

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্‌'আত, প্রত্যেকটি বিদ্‌'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : *সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের সময় এমন কোনো বৈধ কাজ আছে কি –যা বর্জন করা উচিত। যেমন- আহার গ্রহণ, স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি।*

আব্দুন নূর
কানাইঘাট, সিলেট।

জবাব : কোনো কাজ অবৈধ নয়। প্রকৃত পক্ষে সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। বিধায় সে সময়ে মহান আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করা এবং সুন্নাহ মোতাবিক সালাত আদায় করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللهِ، يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوْفًا، فَاذْكُرُوْا اللهَ حَتّٰى يَنْجَلِيَا».

"নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ কারো মৃত্যু বা জীবনের জন্য সংঘটিত হয় না। বরং এ দু'টি মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। এর দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান। অতএব, যদি তোমরা গ্রহণ দেখো, তাহলে এটা বিলীন হওয়া পর্যন্ত মহান আল্লাহকে স্মরণ করো"– *(সহীহ মুসলিম- হা. ৬/৯০১)*। উল্লেখ্য যে, আহার বা স্ত্রী সহবাস বর্জন কুসংস্কার মাত্র।

জিজ্ঞাসা (০২) : *মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে গিয়ে আদায় করতে পারবে কি? প্রকৃতপক্ষে মহিলাদের জন্য কোন্‌টি উত্তম? জানালে উপকৃত হবো।*

নাসরীন আক্তার
বাড্ডা, ঢাকা।

জবাব : মহিলারা চাইলে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবে– *(সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১০৫৯)*। তবে তাদের জন্য বাড়িতে সালাত আদায় করা উত্তম– *(সুনান আবূ দাউদ; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১০৬২ ও ১০৬৯)*। জুমু'আর সালাতে তাদের জন্য মসজিদে যাওয়া ভালো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'তোমরা মহিলাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করো না'– *(সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১০৮২)*। তবে মহিলাদের জন্য ঈদের মাঠে যাওয়া জরুরি– *(সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৪৩১)*।

জিজ্ঞাসা (০৩) : *জানাযা বা মাইয়্যেতের সালাতে সানা পড়া দলিল দ্বারা প্রমাণিত কি না? এ ব্যাপারে সঠিক জবাব জানতে চাই।*

আবুল ফজল
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

জবাব : জানাযা বা মাইয়্যেতের সালাতে সানা পড়ার কোনো দলিল পাওয়া যায় না। প্রথম তাকবীর দেয়ার পর সাধারণ নিয়মে সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করতে হবে। এটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাত। সাহাবী আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জানাযার সালাতের বিবরণ এভাবে দিয়েছেন– *(সুনান আন্ নাসায়ী; বায়হাক্বী; মুসান্নাফ 'আব্দুর রাযযাক্ব- হা. ৬৪২৮)*। সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জানাযায় সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করে বলেন– মানুষ যেন জেনে নেয় –এটি সুন্নাত– *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৩৩৫; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩১৮২; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১০৩২ ও সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৪৯৫)*। অতএব জানাযায় প্রথম তাকবীর দেয়ার পর যথারীতি সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করতে হবে। সানা পাঠের যেহেতু কোনো প্রমাণ নেই, তাই এটি পাঠ না করাই উত্তম। আল্লাহ তা'আলা অধিক পরিজ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা (০৪) : *কোনো কোনো মসজিদে দেখি ইমাম সালাম ফিরানোর পর মুসল্লিদের দিকে ঘুরে বসেন। আর বেশিরভাগ মসজিদে দেখি ইমাম সালাম ফিরায়ে ক্বিবলামুখী বসে থাকেন এবং দ্রুত সম্মিলিত মুনাজাত করে সুন্নাত শুরু করে দেন। আমি জানতে চাই– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন্‌টি করেছেন?*

মো. আমীনুল ইসলাম
ঊনপাড়া, নাটোর।

জবাব : ইমাম সালাম ফিরানোর পর ডান দিক হয়ে ঘুরে মুসল্লিমুখী হয়ে বসাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাত। সাহাবী সামুরাহ্ ইবনু যুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : "নবী (ﷺ) সালাত আদায় করলে আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন"– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৮৪৬ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৭১)*। সাহাবী আল বারা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : "আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পেছনে সালাত আদায় করতাম, তখন আমরা তাঁর (ﷺ) ডান দিকে বসাকে পছন্দ করতাম –যাতে তিনি (সালাম ফিরানোর পর) আমাদের দিকে ঘুরে বসেন"– *(সহীহ মুসলিম- হা. ৭০৯ ও সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৬১৫)*। অতএব, সালাম ফিরানোর পর ইমাম সাহেব ক্বিবলামুখী না বসে মুসল্লিগণের দিকে ঘুরে বসবেন –এটাই সুন্নাত।

জিজ্ঞাসা (০৫) : আমার অনেক সময় আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অহেতুক ধারণা বা প্রশ্ন মনে ভিড় করে। তাই খুব ভীত থাকি– না জানি আমি কাফির হয়ে যাচ্ছি কি-না। এ রকম অবস্থায় আমার ঈমান রক্ষার উপায় কি? মেহেরবাণী করে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

সিকান্দার মন্ডল
কাপাশিয়া, গাজীপুর।

জবাব : আপনি এরূপ সন্দেহভাজন সাথী পরিহার করুন! আর অযথা ধারণা করা হতে বিরত হোন! অহেতুক ধারণা শয়তানী প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই না। এ ধরনের প্রশ্ন মনে জাগলে তাৎক্ষণিক তা হতে বিরত হোন এবং বলুন, "আ-মানতু বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহি।" তাহলে এ ওয়াসওয়া আপনার ঈমানে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না– *(সহীহ মুসলিম- হা. ১১৯)*। অতএব, সন্দেহমুক্ত সহীহ-শুদ্ধ ঈমানের উপর ক্বায়েম থাকুন; সন্দেহকে পরিহার করুন।

জিজ্ঞাসা (০৬) : ছেলেদের গলায় মালা বা স্বর্ণের চেইন ব্যবহার করার হুকুম কি? আমাদের বর্তমান সমাজের অনেক মুসলিম এ ধরনের কাজ করছেন। দলিল-প্রমাণসহ জবাব দিলে উপকৃত হবো।

রায়হান কবির
সদর, বগুড়া।

জবাব : ওটা নারীত্বের লক্ষণ। পুরুষের মাঝে যখন মেয়েলী স্বভাব এসে যায় তখনই এমনটি হতে পারে। অথচ পুরুষের মাঝে থাকার কথা ছিল সাহসী বীরের চরিত্র। পুরুষের গলায় মালা বা চেইন ব্যবহার করলে শরিয়তের কয়েকটি বিধান লঙ্ঘন হয় : ১. নারীর সাথে সাদৃশ্য যা পুরুষের জন্য হারাম– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৫৪৬)*। ২. স্বর্ণ ব্যবহার যা পুরুষদের জন্য হারাম– *(সুনান আবূ দাঊদ- ৪০৫৭, আলবানী সহীহ)*। তবে পুরুষদের জন্য বৈধ রয়েছে রৌপ্যের আংটি ব্যবহার করা– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৫২৮)*। আল্লাহ তা'আলা অধিক অবগত।

জিজ্ঞাসা (০৭) : মাসজিদ মহান আল্লাহর ঘর। এ ঘরের পবিত্রতা রক্ষা করা ঈমানী দায়িত্ব। আমার জিজ্ঞাসা- মসজিদে কোন অন্যায় হলে বাইরের অন্য জায়গার তুলনায় পাপ কি বেশি হবে? আশাকরি সঠিক উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

মো. ইলিয়াছ
গথরিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

জবাব : মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা এবং এর আদবের ব্যাপারে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। কা'বা ঘরে কোনো অন্যায় করলে আল্লাহ তা'আলা মর্মন্তুদ শাস্তির কথা বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

"আর যে ব্যক্তি তাতে (কা'বায়) যুল্‌ম তথা শির্‌ক-এর দিকে ঝুঁকবে, আমি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবো"– *(সূরা আল হাজ্জ : ২৫)*।

মসজিদে কোনো অন্যায় করা হারাম। একদা দু'জন আগন্তুক মসজিদে নববীতে উচুঁ আওয়াজে কথা বললে খলীফা 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খুব রাগান্বিত হলেন এবং বললেন : তোমরা মেহমান না হলে তোমাদের আমি প্রহার করে ব্যথা দিতাম। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৪৭০)*

যদিও উপরোক্ত ধমকী ক্বা'বাহ্ ও মসজিদে নববীর বেলায় বলা হয়েছে, তবুও পৃথিবীর সকল মাসজিদ মহান আল্লাহর ঘর হওয়ায় সেগুলোর পবিত্রতা রক্ষা করাও অপরিহার্য। এসব পবিত্র স্থানে 'আমল করলে যেমন বেশি সাওয়াব রয়েছে; ঠিক তেমনি কোনো অন্যায় করলেও এর পরিণাম হবে ভয়াবহ। শরিয়তে অপরাধের ভয়াবহতার কথা বলা হলেও কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। তাই অপরাধের পরিমাণ ও শাস্তি প্রতিশোধ গ্রহণকারী মহান আল্লাহই ভালো জানেন। আমাদেরকে সকলপ্রকার অন্যায় থেকে দূরে অবস্থান করতঃ মহান আল্লাহর ঘরগুলোর যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করা উচিত।

জিজ্ঞাসা (০৮) : আমরা সালাতের মধ্যে সাব্বি হিসমা রব্বিকাল আ'লা শুনায় বলি– সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা। অন্য কিছু সূরাতেও এভাবে জবাব দিয়ে থাকি। এ সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

হাফিজুর রহমান
ভরসাপাড়া, গোপালগঞ্জ।

জবাব : সালাতে সূরা আল 'আলা'র প্রথম আয়াত "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" পড়ার পর "সুবহানা রাব্বিয়ালা 'আলা" বলার হাদীস ইবনু 'আব্বাস থেকে বর্ণিত। হাদীসটি সহীহ। *(সহীহ আবূ দাঊদ- হা. ৪/৩৯; ইবনু হাজার 'আত্ তাকরীব- ১; আদ্ দুররুল মানসুর- ৬/৩২৬ পৃ.)*

আর সূরা আর্ রহ্মা-ন-এর ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ আয়াতখানা পড়ার পর তার জবাবে বর্ণিত বাক্যটি একাধিক সূত্রে 'আমলযোগ্য প্রমাণিত হয়। তাছাড়া অন্যান্য আয়াতের জবাবে কোনো কিছু বলার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৯) : এম. এল. এম. কোম্পানির ব্যবসা কী জায়িয? এ সব কোম্পানি বিক্রীত পণ্য থেকে "ওয়ান স্টার" থেকে "টেন স্টার" পর্যন্ত প্রায় ৬০% কমিশন গ্রহণ করা হয়। এ গ্রুপে কাজ করে অর্থ উপর্জন বৈধ হবে কী?

কায়সার
বুড়িচং, কুমিল্লা।

জবাব : এম. এল. এম কোম্পানির ব্যবসানীতি অস্পষ্ট। তাতে প্রতারণার সম্ভাবনা রয়েছে এবং অন্যের হক্ব সুকৌশলে আত্মসাৎ করার প্রবণতা বিদ্যমান। কাজেই এটা জায়িয নয়– *(সহীহ মুসলিম- হা. ১০২; জামে আত্ তিরমিযী- হা. ১৩১৫)*। এ ধরনের ব্যবসাকে গারার বা অজ্ঞাত ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন :

«نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গারার (অজ্ঞাত ক্রয়-বিক্রয়) হতে নিষেধ করেছেন। *(মুসলিম- হা. ৪/১৫১৩; আবূ দাঊদ- হা. ৩৩৭৬, সহীহ; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১২৩০, সহীহ; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪৫১৮, সহীহ; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২১৯৫)*

জিজ্ঞাসা (১০) : আমি শুনেছি যে ৪ আনা পরিমাণ স্বর্ণ পুরুষরা ব্যাবহার করতে পারে। আমার শুনা কি সঠিক?

আনাস
উত্তরখান, ঢাকা।

জবাব : পুরুষদের জন্য স্বর্ণের তৈরি চেইন, আংটি বোতাম ইত্যাদি ব্যবহার করা হারাম।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। মহানবী (ﷺ) ডান হাতে রেশম এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিলেন। অতঃপর বললেন :

«إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ».

"এই দু'টি বস্তু আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য হারাম।" *(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৫১৪৪; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪৩৪১, ৪৩৮৪, ৪৩৯৪)*

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে স্বর্ণের আংটি হাতে পড়া অবস্থায় দেখলেন, তিনি তা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন,

«يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِيْ يَدِهِ».

"তোমাদের কারো কি ইচ্ছা করে জাহান্নামের অঙ্গার কে হাতে নিয়ে ব্যবহার করে?" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৫২/২০৯০)*

উল্লেখ্য যে, পুরুষরা গলার চেইন, হাতের বালা, কানের দুল ইত্যাদি কোনো কিছুই পরিধান করতে পারবে না। কারণ এসব নারীদের অলংকার ও পরিধেয়। মহানবী (ﷺ) মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ এবং পুরুষদের সাদৃশ অবলম্বনকারী নারীদের অভিশম্পাত করেছন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৮৮৫)*

জিজ্ঞাসা (১১) : আমি এক আলেমের মুখে শুনেছি মসজিদে বিবাহ পাড়ানো সুন্নাত। বিষয়টির সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই।

আব্দুল কাদের
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

জবাব : মসজিদে বিবাহ পড়ানো সুন্নাত নয়। যদিও অনেকেই পছন্দ করে থাকে। এমনকি অনেক 'আলিমও এই বিষয়ে তাদের বয়ানে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। এ মর্মে বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য নয়। হাদীসটি নিম্নরূপ :

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন :

«أَعْلِنُوْا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ».

"তোমরা বিবাহের প্রচার করো, তা মসজিদে সম্পাদন করো এবং তাতে দফ বাজাও।" *(জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১০৮৯; বাইহাক্বী- হা. ১৪৪৭৬)*

বর্ণিত হাদীসের সনদে একজন ''ঈসা ইবনু মাহমূন' হাদীস বর্ণনায় য'ঈফ, হাদীসটি বাইহাক্বীতেও বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বর্ণনাধারায় রয়েছে– 'খালিদ ইবনু ইলয়াস' নামক একজন বর্ণনাকারী, তিনি হলেন মুনকারুল হাদীস। *(ফাতাওয়া আল্লাজনা আদদায়িমাহ লিল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা- ১৮/১১২)*

উক্ত বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ফাতাওয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে–

«وَأَمَّا عَقْدُ النِّكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ، وَالْحَدِيْثُ الْمَذْكُوْرُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، بَلْ هُوَ ضَعِيْفٌ».

"মসজিদে বিবাহ সংঘটিত করা সুন্নাত নয়, এই মর্মে উল্লিখিত হাদীস দলিলমূলক নয়; বরং তা য'ঈফ।" *(প্রগুক্ত- পৃ. ১৮/১১২)*

জিজ্ঞাসা (১২) : ***আমাদের সমাজে দেখা যায় বিয়ের পর মেয়েরা তার নামের সাথে স্বামীর যুক্ত করে নিজের পরিচয় প্রদান করেন। এরূপ করাতে শরিয়তে কোনো বাধা আছে কী?***

আয়েশা সিদ্দিকা
সেন্ট্রাল রোড, রংপুর।

জবাব : কোনো নারী বিবাহের পর তার স্বামীর নামের একাংশের সাথে যুক্ত করে নিজের নামকে মিলানো ইসলামী শরিয়ার খেলাফ। এটি একটি নতুন বিবাহ। নবী (ﷺ)-এর স্ত্রীগণ কেউ তাকে বংশীয় নাম পরিবর্তন করে বা তাতে বৃদ্ধি করে নবী (ﷺ)-এর নামে নামকরণ করেননি; বরং তারা নিজেদের পিতা ও পিতৃ বংশের নামের সাথেই আজীবন যুক্ত ছিলেন। যেমন- 'আয়িশাহ্ বিনতু আবূ বক্‌র, হাফসাহ্ বিনতু 'উমার, যায়নাব বিনতু জাহশ (রাযিয়াল্লাহু আনহুন)। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

﴿ادْعُوْهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ﴾

"তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাকো। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায় সঙ্গত।" *(সূরা আল আহ্যা-ব : ৫)*

ইসলামে পিতৃপরিচয়ে পরিচিত হওয়ার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে পিতৃপরিচয় বাদ দেয়াকে গর্হিতকর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। মহানবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

«لَا تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ».

"তোমরা তোমাদের পিতৃসম্পর্ক ও পরিচয়কে উপেক্ষা করো না, যে তার পিতৃসম্পর্ককে উপেক্ষা করে সে কুফ্‌রীতে নিপতিত।" *(সহীহুল বুখারী- কিতাবুল ফারায়িয, হা. ৩৩১৫, ৬৭৬৮)*

স্ত্রীরা স্বামীর নামের একাংশে নামকৃত হওয়াটা সমীচীন নয়। সর্বাবস্থায় পরিতাজ্য। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৭১৮)*

জিজ্ঞাসা (১৩) : ***সন্তানের 'আক্বীক্বাহ্ করা কি বাধ্যতামূলক? যদি তাই হয়, তা হলে কারো সাধ্য না থাকলে তার বিধান কি?***

কালাম আহমাদ চৌধুরী
কুমারপাড়া, সিলেট।

জবাব : সন্তানের 'আক্বীক্বাহ্ করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : "সপ্তম দিনে 'আক্বীক্বাহ্ করো এবং সুন্দর নাম রাখো...।" *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৪৫৫, সহীহ)*

কারো সাধ্য না থাকলে আল্লাহ তা'আলা তার উপর কোনো বোঝা চাপান না। ইরশাদ হচ্ছে– "আল্লাহ কারোর উপর সাধ্যাতীরিক্ত কোনো দায়িত্ব দেন না।" *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৮৬)*

অতএব, যার সামর্থ্য আছে সে 'আক্বীক্বাহ্ করবে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে করবে না।

জিজ্ঞাসা (১৪) : ***আমাদের বর্তমান সমাজে পাতলা মোজা পরিধান করা হয়। এ ধরনের পাতলা মোজার উপর মাসেহ করা জায়িয হবে কি? কেননা আমাদের অনেকে বলেন, মোজার উপর মাসেহ করতে হলে মোজা দু'টি চামড়ার হতে হবে। এরূপ শর্ত কি আবশ্যক? জানালে উপকৃত হবে।***

মানুনুল হক
ঈশ্বরদী, পাবনা।

জবাব : মোজার উপর মাসেহ করা সুন্নাত। এটি আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত-এর একটি অন্যান্য বৈশিষ্ট্য; বরং এটি শী'আদের বিপরীত কাজ। মোজার উপর মাসেহ করা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর 'আমল দ্বারা প্রমাণিত। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩৮৭; সহীহ মুসলিম- হা. ২৭২)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মোজা চামড়ার হতে হবে মর্মে কোনো শর্ত আরোপ করেননি; বরং সহজ করার জন্যই মূলতঃ মোজার উপর মাসেহের বিধান দেয়া হয়েছে। আর পাতলা মোজা বা মোটা মোজা খোলা ও পরা একইরূপ। কাজেই পাতলা মোজার উপর মাসেহ করাতে কোনো আপত্তি নেই। *(ফাতওয়া ইবনু 'উসাইমীন- হা. ৪০৪৭; ফাতওয়া ইবনে বায- হা. ৪১৫১৩)*

জিজ্ঞাসা (১৫) : ***আমাদের সমাজে মুমূর্ষু রোগীর শীয়রে বসে 'সূরা ইয়া-সীন' তিলাওয়া করা হয়। এটি না-কি সুন্নাহসম্মত কোনো আমল? বিস্তারিত জানাবেন।***

মো. মনিরুজ্জামান
কালিয়া, নড়াইল।

জবাব : এ মর্মে মুসনাদে আহমাদ, ইবনু হিব্বানসহ কিছু সুনানের কিতাবে এ মর্মে ২টি বাক্যে অভিন্ন অর্থে ১টি হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি হলো–

اقْرَءُوْا عَلٰى مَوْتَاكُمْ ﴿يس﴾.

অর্থাৎ- "তোমাদের মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যাক্তির নিকট সূরা ইয়া-সীন পাঠ করো!" –তবে তা য'ঈফ বিধায় 'আমলযোগ্য নয়। *(বিস্তারিত দেখুন : শাইখ আলবানী [রাহিমাহুল্লাহ] কর্তৃক তাহ্ক্বীক্বকৃত ইরওয়া- হা. ৬৮৮; আল-সিলসিলাহ আল-য'ঈফাহ্- হা. ৫৮৬১)* ❑

প্রচ্ছদ রচনা

মসজিদে খায়েফ

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

সৌদি আরবের মক্কা নগরীতে অবস্থিত ঐতিহাসিক একটি স্থাপনা মসজিদে খায়েফ। এই মসজিদটি মিনার দক্ষিণে ছোটো জামারাতের কাছাকাছি একটি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। ইসলামের ইতিহাসে এটি এমন একটি মসজিদ যেখানে মুহাম্মদ (ﷺ)-সহ আরো অনেক নবী-রাসূলগণ সালাত আদায় করেছেন। পাহাড়ের চেয়ে নিচু এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উঁচু স্থানকে আরবি পরিভাষায় খায়েফ বলা হয়। আবার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকাসম ভূমিকেও খায়েফ বলে আরবরা। মসজিদ আল খায়েফের বৈশিষ্ট্য কিছু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)'র একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন, 'মসজিদে আল খায়েফে সত্তরজন নবী-রাসূল সালাত আদায় করেছেন।'[১৪৪] কারো কারো মতামত হলো– এই মসজিদে ৭০ জন নয়; বরং ৭০০ জন বা তারও অধিক সংখ্যক নবী-রাসূল সালাত আদায় করেছেন। তবে এই সংখ্যা ও মতামতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য শক্তিশালী কোনো তথ্যসূত্র পাওয়া যায়নি। এই মসজিদটি ইসলামের ইতিহাসের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি ধারণ করে আছে। আর তা হালো– পঞ্চম হিজরিতে ইহুদিদের ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারণায় মক্কার কাফেররা মদিনায় হামলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই হামলা উপলক্ষ্যে মক্কার কাফেররা বড়ো বড়ো ও শক্তিশালী কিছু আরব গোত্রের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে। পরবর্তীতে ইসলামের বিজয়ের পর এই চুক্তি সম্পাদিত স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। ইসলামের ইতিহাসের সেই স্মৃতি ধারণকারী মসজিদটিই হলো– মসজিদে খায়েফ।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় এসেছে ২৪০ হিজরিতে এক প্রলয়ঙ্করী বন্যায় ধসে পড়ে খায়েফ মসজিদটি। তবে বন্যা শেষ হওয়ার পরপরই মসজিদটি আবার নির্মাণ করা হয় এবং এর চারপাশে গড়ে তোলা হয় বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থা। সে সময় এই মসজিদের দৈর্ঘ্য ছিল ১২০ মিটার এবং প্রস্থ ছিল ৫৫ মিটার। সে হিসাবে এটি ছিল ওই সময় আরব অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো মসজিদ। এমনকি তখন মসজিদে হারামের চেয়েও বড় ছিল এই মসজিদের আয়তন। ৮৭৪ হিজরিতে মিসরের মামলুকি সুলতান কাইতবা এই মসজিদ পুনর্নির্মাণ করেন। মসজিদের ওই স্থাপনাটি কয়েক দশক আগ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সর্বশেষ মসজিদের আয়তন আগের চেয়ে চারগুণ বাড়িয়ে প্রায় ২৫ হাজার বর্গমিটার করে ১৪০৭ হিজরি মোতাবেক ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে মসজিদটি আজকের এই নয়নাভিরাম সৌন্দর্য ধারণ করে। তিন কোটি পনেরো লাখ রিয়াল ব্যয়ে নির্মিত এই মসজিদে একত্রে ত্রিশ হাজার মুসল্লি সালাত আদায় করতে পারেন। মসজিদের চারকোণায় অবস্থিত চারটি সুউচ্চ মিনার মসজিদটিকে দান করেছে অপার সৌন্দর্য। হজ্জের মৌসুমে মিনায় শয়তানের স্তম্ভে পাথর নিক্ষেপের সময় মসজিদটিতে মুসল্লিদের প্রচুর ভিড় দেখা যায়। মসজিদের সামনে স্থাপিত সাইনবোর্ডে সাতটি ভাষায় লেখা রয়েছে মসজিদের নাম। সেখানে বাংলাতেও লেখা আছে– 'আল খায়েফ মসজিদ'। ❑

বিবদমান দু'জনের মাঝে মীমাংসার প্রতিদান জান্নাত

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, প্রতি (সপ্তাহ) সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত রাখা হয়। যে আল্লাহ তা'আলার সাথে শির্ক করে না, এমন প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়– তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যার সাথে তার ভাইয়ের দুশ্‌মনী, মনোমালিন্য ও বিবাদ রয়েছে। (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে) বলা হয়– তারা উভয়ে আপোষ-মীমাংসা করে নিক। তারা উভয়ে আপোষ-মীমাংসা করে নিক। তারা উভয়ে আপোষ-মীমাংসা করে নিক। *(সহীহ্ মুসলিম- মা. শা., হা. ৩৫/২৫৬৫)*

** শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

[১৪৪] মজমাউজ জাওয়াহিদ।

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি

আগস্ট

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৪:০০	০৫:২৭	১২:০৬	০৩:২৯	০৬:৪২	০৮:১২
০২	০৪:০১	০৫:২৮	১২:০৬	০৩:২৯	০৬:৪২	০৮:১২
০৩	০৪:০১	০৫:২৮	১২:০৬	০৩:২৯	০৬:৪১	০৮:১১
০৪	০৪:০২	০৫:২৯	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪১	০৮:১১
০৫	০৪:০২	০৫:২৯	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪০	০৮:১০
০৬	০৪:০৩	০৫:৩০	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৩৯	০৮:০৯
০৭	০৪:০৪	০৫:৩০	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৩৯	০৮:০৯
০৮	০৪:০৪	০৫:৩০	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৩৮	০৮:০৮
০৯	০৪:০৫	০৫:৩১	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৩৭	০৮:০৭
১০	০৪:০৬	০৫:৩১	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৩৬	০৮:০৬
১১	০৪:০৬	০৫:৩২	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৩৬	০৮:০৬
১২	০৪:০৭	০৫:৩২	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৫	০৮:০৫
১৩	০৪:০৭	০৫:৩২	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৪	০৮:০৪
১৪	০৪:০৮	০৫:৩৩	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৩	০৮:০৩
১৫	০৪:০৯	০৫:৩৩	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৩	০৮:০৩
১৬	০৪:০৯	০৫:৩৪	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩২	০৮:০২
১৭	০৪:১০	০৫:৩৪	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩১	০৮:০১
১৮	০৪:১০	০৫:৩৪	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩০	০৮:০০
১৯	০৪:১১	০৫:৩৫	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:২৯	০৭:৫৯
২০	০৪:১২	০৫:৩৫	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:২৯	০৭:৫৯
২১	০৪:১২	০৫:৩৬	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:২৮	০৭:৫৮
২২	০৪:১৩	০৫:৩৬	১২:০২	০৩:২৮	০৬:২৭	০৭:৫৭
২৩	০৪:১৩	০৫:৩৬	১২:০২	০৩:২৮	০৬:২৬	০৭:৫৬
২৪	০৪:১৪	০৫:৩৭	১২:০২	০৩:২৮	০৬:২৫	০৭:৫৫
২৫	০৪:১৪	০৫:৩৭	১২:০২	০৩:২৮	০৬:২৪	০৭:৫৪
২৬	০৪:১৫	০৫:৩৭	১২:০১	০৩:২৮	০৬:২৩	০৭:৫৩
২৭	০৪:১৫	০৫:৩৮	১২:০১	০৩:২৭	০৬:২২	০৭:৫২
২৮	০৪:১৬	০৫:৩৮	১২:০১	০৩:২৭	০৬:২১	০৭:৫১
২৯	০৪:১৬	০৫:৩৮	১২:০০	০৩:২৭	০৬:২০	০৭:৫০
৩০	০৪:১৭	০৫:৩৯	১২:০০	০৩:২৭	০৬:১৯	০৭:৪৯
৩১	০৪:১৭	০৫:৩৯	১২:০০	০৩:২৬	০৬:১৮	০৭:৪৮